নবযুগ-সামাজিক চিত্রাবলী।

রাধানাথের কন্যাদায়।

বর্ত্তমান সমাজের নিখুঁৎ ফটো।

নবযুগ সম্পাদক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র

উৎসর্গ পত্র।

প্রিয় সুহৃদ

শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,

মহোদয়ের শ্রীকরকমলেষু।

ভাই পাচকড়ি!

"পাঁচু ভায়া" আমার বড়ই আদরের সম্ভাষণ; অতএব আজ তোমাকে সেই আদরের সম্ভাষণেই ডাকিব, দাদা, [illegible] না। তোমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর, আমি মনে করিয়াছি, সমাজটা কি ভাবে চলিতেছে, কেবল তাহারই ছবি আঁকিয়া সমাজকে দেখাইব। ইহা, বোধ হয়, তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। গত বিংশতি বৎসর কাল কলিকাতা নগরে অবস্থিত করিয়া, সহরে এবং পাড়াগাঁয়ে, যে ছবি দেখিয়াছি, আমার ক্ষীণ তুলিকায় সেই ছবিটী আঁকিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। সঙ্কল্প-সিদ্ধ হইতে পারিলে, সমাজের একটুক কাজ করিতে পারিলাম, ইহা মনে করিয়া, এক মুহূর্ত্তের জন্যও গর্ব্বিত হইতে পারিব, ইহা আমার বিশ্বাস আছে।

"দায়ে"র খবর তুমি বেশী রাখ বলিয়া আমার বিশ্বাস। সে জন্যই আজ কন্যাদায়গ্রস্ত রাধানাথকে, তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি তোমার নিজেকে, দায়গ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া, সংসারে চলিয়াছ, এজন্য তোমাকে ভীরু মনে করিয়া ভৎর্সনা করিয়াছি, গালি দিই নাই। আমার এই কথা বিশ্বাস করিয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত রাধানাথকে, ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করিও।

তোমার প্রকৃত সুহৃদ্

পূর্ণ।

কৈফিয়ৎ।

গ্রন্থ লিখিতে হইলে ভূমিকা লিখিতে হয়, এটা অনেকদিন হইতে একটা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, মাসিক-পত্রে, সেই ভূমিকা লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইতে চলিল, তাহাও দেখিতে পাইতেছি।

আমিও একটা ভূমিকা লিখিতে প্রয়াস পাইলাম।

ভূমিকাকে, আমি সাদা কথায়, কৈফিয়ৎ বলিয়াই মনে করি। উদ্দেশ্যটা খোলাসা করিয়া বলিতে হইলেই, বাঙ্গলা হিসাবে, তাহাকে কৈফিয়ৎ বলিতে হয়। আমার উদ্দেশ্যের আভাস, উৎসর্গ-পত্রে পাঁচু ভায়াকে বলিয়াছি, তাহা হইতে কুড়াইয়া লইলেই চলিবে, আর যদি বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক হয়, তবে একটু ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক শেষের কতিপয় পৃষ্ঠায় একবার চক্ষু বুলাইবেন; তাহা হইলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। আমারও শ্রমটা সার্থক হইয়াছে, মনে করিবার সুবিধা পাইব।

গ্রন্থকার।

রাধানাথের কন্যাদায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:*:—

রাধানাথ, কুলীন কায়েতের ছেলে; নিবাস, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর। রাধানাথের পূরা নাম, রাধানাথ মিত্র। রাধানাথ, বাপের এক ছেলে; সুতরাং আদর করিয়া, পনের বৎসর বয়সেই. পিতা-মাতা, রাধানাথের বিবাহ দেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, লোকে এখন, সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে, পঞ্চমুখে পঞ্চকথা বলিয়া থাকে; কিন্তু যখন কোন বিষয়ে, নিজের স্বার্থে হাত পরে, তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া, শিরঃ কণ্ডূয়ণ করিয়া, কাজের কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। গ্রন্থকার মহাশয়ও যে, ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, একথা হলপ করিয়া বলিতে পারেন না। রাধানাথের পিতা, ঋণ-জালে জড়িত হইয়া, বসত বাড়ীখানি বাঁধা দিয়াছিলেন, স্ত্রী-পুরুষ ও পুত্রটী লইয়া, কায়ক্লেশে দিন গুজরাণ করিতেন। রাধানাথ, ছেলে বেলায়, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়া সাঙ্গ

করিয়া, ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন; বাপের দুরবস্থা গতিকে, এণ্ট্রান্সক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পড়া ছাড়িলেন; গ্রামের রাধাকান্ত বসুর আশ্রয়ে থাকিয়া, কলিকাতা হিল্‌জার কোম্পানীর বাড়ীতে এপ্রেণ্টিসী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাধানাথ, মা-বাপের ইচ্ছায় অল্প বয়সেই পরিণীত হইয়াছিলেন। রাধানাথের পিতা, রাধানাথের বিবাহ দিয়া, দেড় হাজার টাকায় বাড়ী বন্ধক, খালাস করিলেন; ছেলের ঘড়ী-ঘড়ীরচেন হইল; নববধূর নব-অঙ্গে ত্রিশ ভরি সোণার গহনা উঠিল,—দিন কতকের জন্য, একরূপ, দশ জনের এক জনের মত হইয়া, খানাকুল গ্রামে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এ সুখ বড় বেশী দিন রহিল না। বিবাহের পরেই রাধানাথ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

ছেলে বিবাহ দিয়া টাকা পাইয়া, যদি নবাবী করা যায়, তার চেয়ে আর সুখ নাই; কিন্তু লোকের ভাগ্যে তাহা বড় বেশী দিন ঘটে না। মানুষ তাহা বোঝে না; তাই ছেলের বাপ হইয়া যদি দেখিল, ছেলেটী পঞ্চদশের ঘরে পা দিয়াছে, তখন মুদী, পসারী, কাপড়ওয়ালা, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি ছত্রিশ বর্ণ পাওনাদারকে, ছেলে দেখাইয়া, ধার করিয়া খাইতে আরম্ভ করে। পোড়া মিন্সেরাও, ছেলে

দেখিয়া, যত চায়, অবলীলা-ক্রমে ধার দেয়। যাঁহারা ষ্টার থিয়েটারের "বিবাহ-বিভ্রাটের" অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এসম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে হইবে না। এখন কাজের কথা বলি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাসের দিকে লোকের ঝোঁক্‌টা এখন কিছু বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের দিকে এখন হিন্দু সমাজের নেক নজরটা কিছু বেশী পড়িয়াছে। ছেলের বিয়ের জন্য বাপের যেমন পাসের দিকে নজরটা থাকে, মেয়েওয়ালার থাকে, তাহা অপেক্ষা আরও বেশী। 'পাস', এ বড় চাপরাস, ছেলের বাপ এ দিকে না চাহিলে ত, তার দেনার কুলকিনারা হইবে না, কাজেই সে দিকে দৃষ্টিটা রাখিতে হয়। মেয়েওয়ালা ভাবেন,—এখন বে-পাসে, আর পাশ ফিরিবার যো নাই; চাকরীই কর, আর ওকালতীই কর, আর দুনিয়ার যা কিছু আছে, তা কর, বিনা পাসে আর পাশ ফিরিবার যো নাই; কিন্তু পাসের দিকে চাহিতে হইলে, অনেক কাটি খড় খরচের দরকার। আরও একটুক খোলসা করিয়া বলিতে হইল।

যাঁহার ছেলেটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটী ধাপ অতিক্রম করিয়াছে, সে মনে করিতেছে, আমাকে আর পায় কে! বর্ত্তমান সময়ে, মেয়ের বাজার বড় সস্তা, একথা প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়া না বলিলেও চলে; সুতরাং ছেলের বাজার টান; বলা বাহুল্য, ছেলেওয়ালার বুক খানি চৌদ্দপোয়া চওড়া! যে ছেলেওয়ালার ছেলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুই ধাপ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার আস্পর্দ্ধা আরও কিছু বেশী। তাহার মনের ভাব, ফি ধাপে সহস্র মুদ্রা! ছেলে, দুই ধাপ মাড়াইয়া থাকিলে, দুই সহস্র মুদ্রার ত কথা ই নাই; বাড়ীতে যদি সপ্তম পুরুষের মধ্যে, কখনও লোহার সিন্ধুকের সহিত সম্পর্ক না থাকিয়া থাকে, তবে কাশীপুরের দাস কোম্পানীর কারখানা হইতে লোহার সিন্ধুকের ফরমাশ, তখনি দেওয়া হয়। আমাদের রাধানাথ বাবু, এই টানের বাজারে, একজন খরিদ্দার।

রাধানাথ, হিল্‌জার কোম্পানীর বাড়ীতে কেরাণী-গিরি করেন, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা! বিবাহ হইয়াছে, আজ, পনের বছর; এই সময়ে, মা ষষ্ঠীর কৃপায়, রাধানাথের কন্যাসন্তান পাঁচটী। জ্যেষ্ঠার বয়স ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশে পা পড়িয়াছে। রাধানাথের মুখে কথা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, পেটে ভাত নাই; রোজ রোজ সকালবেলা, কড়াইয়ের

ডাল, আর পুঁইশাক চচ্চরি দিয়া আধ্‌পেটা খাইয়া, চাকুরী বাজাইতে হয়; বাড়ী হইতে আপীশে যাইবার সময়, তেরবছুরে আইবুড় মেয়ের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, সেই আধপেটা ভাত কয়টা, তণ্ডুলত্ব প্রাপ্ত হয়। সওদাগরী আপিশে চাক্‌রীতে দু'পয়সা উপরি ফায়দা আছে, ইহা সকলের মনেই বদ্ধমূল ধারণা; রাধানাথের পক্ষে একথাটা স্বপ্ন! উপরি ফায়দা দূরে থাকুক, নির্দ্দিষ্ট বেতনের পূরাপূরি টাকাটা ঘরে আনিবার সুবিধা, সকল মাসে পান না। আজ আধ ঘণ্টা বিলম্বে, উপর-ওয়ালার দুটা কাণমলা,—কাল কুড়ি মিনিট বিলম্বের জন্য আট আনা জরিমানা! এইরূপ পদেপদে আক্কেল-সেলামী দিয়া ও, ঝরতি পরতি বাদ দিয়া, ফি মাসে পূরা মাহিয়ানার টাকাটা ঘর-দাখিল করা, আজিকার বাজারে বিষম ব্যাপার! আমাদের রাধানাথ, এই ব্যাপার-সমুদ্রে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইতেছেন,—ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন— কি ঝক্‌মারীতে পড়িয়াছি! শুধু ইহাই কি তাঁহার উদ্বেগের কারণ? গিন্নিটী পাঁচ ছেলের মা; পাশের বাড়ীর এটর্ণী, মাণিকবাবুর গিন্নির গায়ে, ফ্রেলদার সেমিজ দেখিয়া, কেউটে সাপের মতন ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে বলিতে লাগিলেন, পাঁচ ছেলের মা হইয়াছি বলিয়া, পরিবার সাধ আমার নাই কি? রাধানাথ,

গৃহিণীর কথা শুনিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন, আর বলিলেন, আমার জন্মটা কি শুধু তোমার ফরমাশ খাটিবার জন্যই হইয়াছিল?

গৃহিণীর গর্জ্জন, সমাজের তর্জ্জন, সামান্য অর্জ্জনে কূলকিনারা পায় না, রাধানাথ সর্ব্বদাই এই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অস্থিচর্ম্ম সার! আজ রাধানাথ আপীশ হইতে আসিয়া দেখিলেন, গৃহিণীর গণ্ডস্থল দুটীতে যেন দুটী মাল্‌সা বসান রহিয়াছে। এদিকে ঘট্‌কী ঠাকুরাণী, রাত্রি আটটার পর, সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইবেন, এরূপ কথাও আছে; অন্য দিকে, সেমিজের তাড়নায়, রাধানাথের মনে হইয়াছে,—কাল সকালে কড়াইয়ের ডাল আর পুঁইশাক চচ্চরি বুঝি, ভাগ্যে ঘটিল না! রাধানাথ, কন্যাদায় ও গৃহিণী-দায়ে, দিশাহারা হইয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন, আর মনে করিলেন, গৃহিণীর দায় এড়াইতে না পারিলে, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবে।

রাধানাথ, আপীশ হইতে আসিয়াই গৃহিণীর আদেশে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; সুতরাং হস্তপদ প্রক্ষালন, অথবা দৈবসিক শ্রান্তির পর বিশ্রামে, জলাঞ্জলি দিয়া, পি, সি, পাল কোম্পানীর দোকানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে হইল। যাহাদের হৃদয় পাষাণে গঠিত, যাহাদের আত্মা, আত্মসুখ ব্যতীত আর কিছু জানে না,

না বোঝে না, তাঁহাদের হৃদয়ে, রাধানাথের বর্ত্তমান অবস্থার নিখুঁৎ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবার আশা করা বৃথা। রাধানাথের অদৃষ্টও, স্বীয় সহধর্ম্মিনীর সম্বন্ধে, তাহার অন্যথা হয় নাই, হইতেও পারে না।

রাধানাথ পি, সি, পাল কোম্পানীর দোকানে যাইবার সময়, গৃহিণীকে বলিলেন,—"ঘট্‌কীর আসিবার কথা আছে, আসিলে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিও"। গৃহিনী, অবলীলাক্রমে বলিলেন,—"অপেক্ষা করিতে বলিব বটে, কিন্তু যদি অপেক্ষা করিবার সুবিধা তাহার না হয়, বরং কাল আসিবে; কিন্তু আমার সেমিজ হাতে না লইয়া তুমি গৃহে প্রবেশ করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিও।"

রাধানাথের আত্মাপুরুষ কাঁপিয়া উঠিল; বাক্যব্যয়টী না করিয়া, ধীরে ধীরে রাস্তায় বাহির হইলেন, আর নিজের কেরাণী-জীবনের বাপান্ত করিতে করিতে চিৎপুরের রাস্তা ধরিলেন। রাধানাথ সকাল ৮টার সময় আধ্‌পেটা খাইয়া, আপীশে বাহির হইয়াছিলেন; ক্ষুধায় নাড়ী চৌদ্দপুরুষান্ত করিতেছে, সেদিকে আর খেয়াল রহিল না, গিন্নীর তাড়নার সেমিজ আনিতে চলিলেন।

এদিকে ঘট্‌কী আসিয়া রাধানাথের বাড়ী উপস্থিত। গিন্নিকে কর্ত্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; গিন্নি

বলিলেন, তিনি এখনি আসিতেছেন। ঘট্‌কী, একখানা আসন, আপনি লইয়া, কপাট ঠেশ দিয়া বসিল, আর মেয়েটীকে কাছে বসাইয়া, এটা ওটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

পাছে ঘট্‌কী আসিয়া ফিরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় রাধানাথ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াছিলেন; দোকানে পৌছিয়া তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া সেমিজটী লইয়া অমনি পাণ্টা দৌড়! আধ ঘণ্টার ভিতর, সেমিজটী লইয়া আসিয়া গিন্নির হাতে দিয়া হাঁপ ছাড়িলেন।

ঘট্‌কীকে দেখিয়া রাধানাথের কতকটা আশ্বাস জন্মিল। রাধানাথ; ক্ষুধায় কাতর হইলেও, তখন খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন। একখানা আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা ললাটের স্বেদবিন্দু অপসারিত করিয়া, ঘট্‌কী ঠাকুরাণীর মুখোমুখী হইয়া বসিলেন। এ সময়ে রাধানাথের বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল; ঘট্‌কী ঠাকুরাণীর মুখ হইতে, কিরূপ কথা বাহির হইয়া পড়ে, রাধানাথ তখন, তাহা ভাবিয়াই আকুল ছিলেন; ফলে ভাবনাটা চাপা ছিল। তখন ঘট্‌কী ঠাক্‌রুণ বলিলেন,—কেমন মিত্রিজা, এখানে কাজ কর্‌তে মত আছে ত? রাধানাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"আমার কথা ত তোমাকে সমস্তই খুলে বলেছি; এখন, করা না করা, তোমার হাত।"

ঘট্‌কী আর দালালে যে বড় তফাৎ নাই, ইহা বোধ হয়, কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে তফাতের মধ্যে এই যে, দালালের লাইসেন্স আছে, ঘটক ঘট্‌কীর তা নাই; ফলে, উভয়ের কার্য্যটা এক-ই। দালালের দালালী অপেক্ষা, ঘটক-ঘট্‌কীর ঘট্‌কালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। বাজে জিনিসের দালালীর সহিত, ছেলে মেয়ের দালালী, বর-কনের দালালীতে, ইতর বিশেষ থাকা, যতটুকু দরকার, আমাদের এই ঘট্‌কী ঠাকুরাণীর, তাহাতে অভাব ছিল না। রাধানাথের কথা শুনিবামাত্র ঘট্‌কী বলিল,—"তা, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবেই হইতে পারে। ছেলেটী দিব্বি, গায়ের রঙ ফিট্ গৌরবর্ণ না হউক, লোকে নিন্দে কর্‌তে পার্‌বে না। সেই গড়ের মাঠে যে এবার ঘোড়ার নাচ, বানর-কুকুরের নাচ, বাঘের খেলা হয়েছিল, শুনেছ ত? সেই খেলোয়ার বোসের ছেলের গায়ের রঙ, আর এ ছেলের রঙে একটুকু তফাৎ নাই। এর রঙ, বরঞ্চ তার চেয়ে, একটু জেল্লা আছে। ছেলেটী ইষ্টার থিয়েটারের ভুনী বোসের কাছে চাক্‌রী করে; মাহিনা পায় পনের টাকা। শুনেছি, ইষ্টার থিয়েটারে, ছেলের বেশ সুনাম সুযশ আছে। "রাবণ বধ" নাটকে এ ছেলে হনুমান সাজে। যারা দেখেছে, তারা বলেছে, এ ছেলেকে যখন লেজ

পরিয়ে হনুমান সাজিয়ে দেয়, তখন ঘরশুদ্ধ লোক দেখে অবাক্ হয়। ছেলের বাপ্‌টীও দু'পয়সা রোজগার করে। প্রায় ১০।১২ খানা গয়লায় দোকানে, সন্ধ্যার পর খাতা লেখেন ; দিনের বেলায়, থিয়েটারের হ্যাণ্ড-বিল, ডাক্তার খানার বিজ্ঞাপন, বিলি করেন ; যেমন ক'রে হোক্, রোজ আট গণ্ডা পয়সা না নিয়ে ঘরে ফিরেন না। ছেলের আট গণ্ডা, আর বাপের আট গণ্ডা, দিন ষোল গণ্ডা ; বল লেখি, এর চেয়ে আর তোমরা কি চাও ?"

ঘট্‌কী ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া, ছেলে সম্বন্ধে, পাঠক-গণের যেরূপ ধারণা হইতেছে, রাধানাথের মনে তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ ছিল না ; কিন্তু কি করে, মাসকাবারি বেতনে, সংসার খরচ কুলায় না। পাঁচটী মেয়ে, গিন্নি, আর স্বয়ং : দুটি টাকা মাহিয়ানার দিবারাত্রির ঝিও একটি আছে ; তাহাকে মাহিয়ানা ছাড়া, দুই একাদশীতে বার পয়সা, নারিকেল তেলের দাম ছয় পয়সা, বছরে তিন জোড়া কাপড়, চারিখানা গামছা, সেলামী দিতে হইবে ; আর গিন্নির থালার সনান পরতা করিয়া, দুবেলা, ডানহাতের যোগাড় যোগাইতে হইবে। আবার এই ঝিটি, কাজকর্ম্ম সারিয়া দুবেলাই নিজের বাড়ীতে ভাত লইয়া গিয়া খাবার আবদার করে। এই আবদারে, দুজনের

ভাত একজনের হিসাবে যায়। এই সকল ঝি-মহাশয়ারা, "কলির খরগোশ" নামক একপ্রকার জীব পুষিয়া থাকে। এই সকল জীবের আহার যোগাইবার জন্যই বাড়ীতে বসিয়া খাইবার সক; আর এই জন্যই একজনের স্থলে দুইজনের ভাত, ঝি রাখিবার আক্কেল সেলামী যায়। রাধানাথের ঝিটিও এই শ্রেণীভুক্তা। কুড়ি টাকার দিকে, ৮ জনের উদরটি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে! মেয়ের বিবাহ ত, আর রাধানাথের মাইনার দিকে চাহিয়া, কথা কহিবে না!

ছেলের গুণাবলী শুনিয়া, রাধানাথ, ঘট্‌কী ঠাক্‌রুণকে বলিলেন,—"ছেলের গুণ গরিমা ত শুনা গেল বেশ, এখন দেনা পাওনার কথাটা কিছু ঠিক হয়েছে কি?" ঘট্‌কী তখন, চক্ষু দুটি টিপিয়া, ঘাড়টি ঈষৎ দোলাইতে দোলাইতে বলিল,—হয়েছে বই কি! তা, তারা যা চেয়েছেন, তা এখনকার বাজারে, তেমন বেশী ব'লে বলা যায় না। কর্ত্তা যা বলেছিলেন, সে কথা ছেড়ে দাও; গিন্নি বল্লেন,—মেয়েটি যদি, দেখতে শুন্তে ভাল হয়, আর সংসারে এসে যদি, কাজেকর্ম্মে আমার সাহায্য করতে পারে, তবে দু'পয়সা কম হলেও আমি কর্ত্তে রাজী আছি। তাতে আবার শুনেছি, মিন্সেটি ছা-পোষা লোক;—তাই তুমি বলো, ছয়শ টাকা নগদ, তিন ভরির বালা, তিন ভরির চিক, দুই ভরির মাকড়ি,

পাঁচ ভরির তাগা, আর তিন ভরির হেশো ; সোণার জিনিষ এই কয়েকখানির বেশী আর চাইনে। তবে রূপা ; তা, ভরি চল্লিশের মধ্যে হলেই চালিয়ে নেব। ইহা ছাড়া ছেলেকে হীরার আংটি, আর ঘড়ী ঘড়ীর চেন।”

রাধানাথ, এক একটি কথা শুনেন, আর এক একটি লম্বা নিশ্বাস্ ছাড়েন! মান বাঁচাইবার জন্য, ছেলের বিদ্যা-বুদ্ধির খোঁজ খবর লইবার ততটা আবশ্যকবোধ ছিল না, কিন্তু টাকা ও গহনার হাঁক ডাক শুনিয়া, তাঁহাতে আর তিনি রহিলেন না! ছয় শত টাকা, তাঁহার আড়াই বছরের বেতন! তাহার উপর আবার সোণা রূপার কথা!! রাধানাথের রাধানাথত্ব, কথা শুনিয়া, ঘুচিয়া গেল। তখন মনে করিলেন, হতভাগা বাবা যদি, কচি বয়সে বিবাহ না দিতেন, তবে ত আর এত শীঘ্র শীঘ্র, ঘট্‌কীর কথা শুনিয়া, আকাশ পাতাল দেখিতাম না। ঘণ্টা খানেক, ঘট্‌কীকে আর কিছু জবাব দিতে পারিলেন না ; রাধানাথের গিন্নি, একটু লম্বা হাসি হাসিয়া বলিলেন,—এ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে, আমরা বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে পাব ত ? ঘট্‌কী তখন কণ্ঠনালীর বিস্তৃতিটা একটু সুবিস্তৃত করিয়া বলিল, ওমা, সে ত আহ্লাদের কথা—জামাই কি কখনো শাউড়ীকে ছেড়ে থিয়েটার কত্তে যেতে পারে!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাধানাথের বিবাহের সময়, পিতা, শ্বশুরের নিকট হইতে কি ভাবে পয়সাটা আদায় করিয়াছিলেন, রাধা-নাথ তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি তখন ভাবিতে-ছিলেন, এবারে তাঁহার নিজের পালা পড়িয়াছে; তাঁহাকেও এ যাত্রা, শ্বশুরের ন্যায়, কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে। এজন্যই, কোন সহজ উপায়ে, কিছু টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধ করিলেন; কিন্তু কি উপায়ে, সহজে সে আশা পূর্ণ হইবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন, পেটেণ্ট ঔষধের কারবার আরম্ভ করিয়া, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেই, হুর হুর করিয়া অর্ডার আসিয়া পড়িবে। কিন্তু অর্ডার আসিলে যে, কোন্ জিনিষটী দিয়া ঔষধের স্থান পূর্ণ করিবেন, তাহা জানিতেন না; এইজন্যই সময়ে সময়ে, পেটেণ্ট ঔষধের কারবার করিবার জন্য, ইচ্ছা হইয়া থাকিলেও, রাধানাথ, ভয়ে সে রাস্তায় হাটিতেন না। এদিকে লোকে, রাধানাথের দ্বারা, বেগার কোন কার্য্যের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে ছাড়িতেন না।

বড়বাজারের একজন মাড়োয়াড়ী, রাধানাথের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, একটী কারবার করিবেন, এই সূত্র ধরিয়া, তাহার নিকট যাতায়াত করেন। মাড়োয়াড়ী মহাশয়, যে ভাবে কথাবার্ত্তা চালাচালি করিতেছিলেন, তাহাতে, বর্ত্তমান অবস্থানুসারে, রাধানাথ, যোগদান করিবার প্রস্তাবে, কতক কতকরূপে সম্মতি প্রদান করেন; এমন কি, স্থলবিশেষে, তিনি এরূপ প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন, দুই একজনের মুখে তাহাও শুনা গিয়াছে। তিনি যখন ঘট্‌কীর কথা শুনিতেছিলেন, "রাধানাথ, রাধানাথ," বলিয়া, সদর দরজায় একটী লোকের ডাক, তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তখন ঘট্‌কীর কথার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, দ্বারের "রাধানাথ" শব্দের প্রতি বেশী লক্ষ্য পড়িল। দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরমবন্ধু, বক্রেশ্বর, একজন মাড়োয়াড়ীকে সঙ্গে করিয়া দরজায় হাজির।

যে মারোয়াড়ীটী রাধানাথের বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম গকুলদাস মাণিকদাস। তিনি বড়বাজারের কোন সম্ভ্রান্ত মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর সম্বন্ধী। ভগ্নিপতির বাড়ীতে থাকিয়া, ভগ্নিপতির ভাত খাইয়া, জাতীয় প্রকৃতির কৃপায়, দু'পয়সার সংস্থান করিয়াছেন; এখন, কাহারও সহিত যোটপ ট ক ি য়া একটী লাভজনক কাজ করিতে পারিলে, তাঁহার পক্ষে

সুবিধা হয়, এই আশায়, রাধানাথের নিকট আগমন। রাধানাথ, গকুলদাসকে দেখিয়া, যথোচিত আদর আপ্যায়িত করত, বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন; ঘট্‌কী কথা, তখনকার মত, চাপা পড়িল। ঘট্‌কী, চলিয়া যাইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, রাধানাথ বলিলেন,—"একটুক অপেক্ষা কর; রাত্রি অধিক হইলে, ট্রাম-ভাড়ার পয়সা দেওয়া যাইবে।"

কলিকাতার ঘট্‌কী, আর ছক্কর গাড়ীর ঘোড়া, বেশী তফাৎ নহে! ছক্করের ঘোড়াগুলি, কোচ্‌মানের ইচ্ছায়, সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত যেমন, কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, কলিকাতার ঘট্‌কীরাও, পয়সার খাতিরে, স্বেচ্ছামত তদনুরূপ ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে। ঘট্‌কী, একটা জাতি বলিয়া, পাঠক মনে করিবেন না; এই ঘট্‌কী শ্রেণীতে—ব্রাহ্মণ আছে, কায়েতের মিত্রি বৌ আছে, আশ্বিনে তাঁতি ভেন্‌কার পিসি আছে;—আর আছে, নাপ্তে বৌ রেধোর পিসি। লোকে ডাকিবার সময়, নাপ্তে বৌ অথবা রেধোর পিসি বলিয়াই ডাকে। আমাদের রাধানাথের বাড়ীতে যে ঘট্‌কী আসিয়াছিল, তিনি আশ্বিনে তাঁতির মেয়ে; ঘট্‌কালী করে, দু'পয়সার সংস্থান, বেশ করেছেন। ইহার নাম রাধামণি, বয়েস পঞ্চাশের

কাছাকাছি, কিন্তু শরীরের বাঁধে এবং মাথার চুলে, এত বয়েস বলিয়া কেহ ঠাওরাইতে পারেন না। রাধামণিরও ইচ্ছা, লোকে তাহাকে বুড়ী না বলে; কিন্তু তাহার আজানুলম্বিত স্তনযুগল, ভূমিচুম্বনলোলুপ হইয়া, নিম্ন দিকে যাবতীয় ভার পরিত্যাগ করিয়াছে। সুগোল সুঠাম দেহ, ধনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া, ক্রমশঃ এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই দেহটীর ভার বহন করিতে, তৃতীয় শ্রেণীর শকটবান, উর্দ্ধশ্বাসে, গাড়ী লইয়া পালায়! ইহারও কারণ আছে। দৈবাৎ, এক দিন, রাধামণি যে গাড়ীতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেই গাড়ীর অশ্ব-যুগল, অর্দ্ধ ঘণ্টায় দুইবার জল পান করিয়াও নিষ্কৃতি পায় নাই। রাধানাথ, এ খবর জানিতেন বলিয়াই, ট্রামকারের কথা বলিয়াছিলেন; কেন না, ট্রামকারের চালক, মোটা মানুষ গাড়ীতে নিবেন না বলিয়া, আপত্তি করিতে পারেন না।

গকুলদাস মাড়োয়াড়ী, রাধানাথের অবস্থার বিষয় অবগত ছিলেন। রাধানাথকে লইয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব, তিনি অনেক দিন হইতেই চালাইতেছিলেন; সুতরাং পরস্পর জানা শুনা, অনেক দিন হইতেই ছিল। রাধানাথের কন্যাদায়ের কথা শুনিয়া, তিনি কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন; আজ সুবিধামত, তাঁহাকে পাইয়া, স্বীয় মনোগত

ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন; কথায় কথায় কথাটা বলিয়াও ফেলিলেন। গোকুলদাস, এক শত টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, সেই মুহূর্ত্তেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর চেক্ দিলেন। স্বার্থ বড় বালাই। ফাঁকতালে, নিজের মতলব হাসিল করিবার জন্য, সুবিধা পাইলে, আমরা কখনও তাহা ছাড়ি না। তাহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত, রাধানাথ; সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ, রাধানাথ, একশত টাকার চেক পাইয়া, গোকুলদাসের নাম ভুলিয়া গেলেন; মনে মনে আকাশকুসুমের ফাঁদ পাতিতে লাগিলেন। রাধানাথ, তখন মনে করিলেন,—এই একশত টাকার পঞ্চাশ টাকা দ্বারা, বঙ্গবাসী ও হিতবাদীতে, সালসার বিজ্ঞাপন দিব; নূতন রাস্তার উপর পাঁচ টাকা ভাড়ায় একখানা ছোট ঘর ভাড়া লইব; দুটী ছোট আলমারী কিনিব, আর আপীশের পূর্ব্বে ও পরে, সকাল বিকালে, সালসার কারবার চালাইব।

রাধানাথ তাহাই করিলেন; "আর, এন্‌, মিত্র এণ্ড কোম্পানী" নামে, এক কারবার খুলিয়া 'সালসার' বিজ্ঞাপন জাহির করিলেন। প্রথম প্রথম, লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সালসা চাহিত বটে; কিন্তু সালসার গুণগরিমার পরিচয় পাইয়া, আর কেহ সেই রাস্তা মাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। তখন রাধানাথের দোকান-

ভাড়া চালান কষ্ট হইল! বাড়ীওয়ালার, পাঁচ মাসের পঁচিশ টাকা ভাড়া, পাওনা হইল। রাধানাথ তখন আর দোকান খোলেন না! বাড়ীওয়ালা হাটাহাটি করিয়া, হয়রাণ পেরেশান হইয়া, ছোট আদালতে নালিশ করিলেন ও মোকদ্দমা ডিক্রী হইল, ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া আলমারী নীলাম করিয়া, বাড়ীওয়ালা ভাড়ার টাকা আদায় করিলেন। এইরূপে গোকুলদাসের একশত টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল, রাধানাথেরও ঔষধের কারবারের সাধ, বেশ মিটিল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:০:—

সালসার কারবারে, রাধানাথের সুবিধা হইল না, সমূলে নষ্ট হইল, দেখিয়া, তখন নূতন কোন উপায়ে কিছু সংস্থান করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল; কিন্তু উপায় কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, সকলের নিকটেই সু-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই সু-পরামর্শ দিতে পারিল না! পাছে, রাধানাথের কন্যাদায়ে, সাহায্য করিতে হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহার কোন আত্মীয়, আদবে ধরা-ছোঁয়াও দিলেন না!

রাধানাথ, তখন বুঝিতে পারিলেন, বিপদ সামান্য নহে ; এ বিপদ উদ্ধার হইতে, আত্মীয়স্বজনের সাহায্যের আশা করা ভুল।

অবস্থা দেখিয়া, সংসারের ভাব-গতিক বুঝিয়া, রাধানাথের শুষ্কহৃদয় আরও শুষ্ক হইল। তিনি ভাবিলেন, কোনরূপ ব্যবসা ব্যতীত, উপস্থিত বিপদ হইতে, তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই নাই। এ দিকে ব্যবসা করিতে যে পূঁজীর দরকার, তাঁহার সে সম্ভাবনাও নাই ; অতএব, কোন্ ব্যবসা করিলে, অল্প পূঁজীতে কার্য্য করা যায়, তখন সেই দিকে লক্ষ্য হইল। রাধানাথ দেখিলেন,—আজি কালি, অনেক চাটুয্যে-মুখয্যে, ঘোষ-বোস্, তামাকের দোকান করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে ; আর, এ ব্যবসা চালাইতে, বেশী পূঁজীরও দরকার হয় না ; সুতরাং তামাকের দোকান করিবেন, স্থির করিয়া, নূতনবাজারের পার্শ্বে, মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া লইলেন। হাঁড়ি-ঠোলা কিনিলেন, পাল্লা-বাটখারা আনিলেন,—পুলের ধারের চক্রবর্ত্তী কোম্পানীর দোকান হইতে, বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নামজাদা স্থানের তামাক, কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া, দোকান ফাঁদিয়া বসিলেন। ঘরের দ্বারে, বড় বড় অক্ষরে, সাইনবোর্ড ঝুলান

হইল. তাহাতে লেখা হইল ;—"মিত্র কোম্পানির সুবাসিত তামাক।"

তামাকের দোকান ফাঁদিয়া, রাধানাথ নূতন ধরণের আর একটী বিপদে পড়িলেন! সালসার দোকানে, আপীশের পরে ও পূর্ব্বে, থাকিলে, কাজ চলিত; এ কারবারে, চব্বিশ ঘণ্টা না থাকিলে চলে না। রাধানাথ তখন, আকাশ-পাতাল দেখিলেন। মাহিনাটী পাইয়া, সাতটী টাকা হাত-খরচের মত রাখিয়া, বাকী তেরটী টাকায় দোকান ফাঁদিলেন, কিন্তু এখন দেখিলেন,—আর একটী লোক, অথবা নিজে না থাকিলে, তামাকের দোকান চলে না! তখন, চাকরী ছাড়িবেন, কি, দোকান ছাড়িবেন; একথাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। রাধানাথ কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; সকাল বিকাল দোকান খুলিয়া, তুই চারি দিন, এরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে সুবিধা বোধ হইল না;—দু'মাসের ছুটী লইয়া দোকানে বসিবেন; যদি বুঝিতে পারেন, তামাকের ব্যবসা, চাকরী অপেক্ষা বেশী সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে, চাকরী ছাড়িয়া দিবেন; না হয়, একজন লোক রাখিয়া দিবেন।

রাধানাথ ছুটী লইয়া, তামাকের দোকান চালাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাহা বড় সুবিধা

জনক হইল না। নিজ হাতে ডারি-পাল্লা ধরিয়া, এক পয়সা আধ পয়সার তামাক বেচা, আর, ফি হাতে জলে ডুবাইয়া হাত ধোয়া, এই কার্য্যটী রাধানাথের পক্ষে বড় সুবিধা-জনক বোধ হইল না। এদিকে এক পয়সা আধ পয়সা হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলেও, একাজে দু'পয়সা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, একটী লোক রাখিবার ব্যবস্থা, মনে মনে স্থির করিলেন। যে কার্য্যে কাঁচা পয়সা, চব্বিশ ঘণ্টা হাতে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, আজিকার বাজারে, তেমন-তর কার্য্যের জন্য লোকের বড় অভাব হয় না। রাধানাথের মুখ হইতে, কথাটী বাহির হইবামাত্রই, তিন চারিজন ওমেদার আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসিক সাত টাকা বেতনে, "অভয়" নামক একজন কায়েতের ছেলেকে দোকানের গোমস্তা নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

অভয়, কায়েতের ছেলে; নামটী তার অভয়কুমার বসু, বাড়ী হুগলী জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর। অভয়ের পিতা, হুগলী কোর্টের একজন মোক্তারের মুহুরী ছিলেন। মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট কিছু ছিল না; তবে ১৫৲ টাকার কম, কোন মাসেই পড়িত না। অভয়ের পিতা এই ১৫৲ টাকা দ্বারা কায়ক্লেশে দিন যাপন করিতেন। অভয় ব্যতীত, তাঁহার আর সন্তান সন্ততি ছিল না; সুতরাং অভয়ের পিতা, অভয়কে খুব ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসার খাতিরে, অভয়ের বাল্যশিক্ষা, যথারীতি, সম্পন্ন হইয়াছিল না। অভয়ের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন শ্রীমান, গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায়, প্রথম নাম লিখাইলেন। ইহার দুই বৎসর পরেই, ওলাউঠা রোগে, অভয়ের পিতৃবিয়োগ হয়। যাহার ভাগ্য-লক্ষ্মী অপ্রসন্ন থাকে, বিপদ তাহার পায় পায়। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অদৃষ্টের বিপদ রাশি যেন, আপনা-আপনি আসিয়া পড়িল! পিতৃবিয়োগের চতুর্থ দিবসেই, অভয়ের মাতৃ-বিয়োগ হইল। দ্বাদশ বর্ষের বালক, অকুল সমুদ্রে

হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। অভয়ের পিতৃবিয়োগের সময়, সামান্য তৈজশ-পত্র ভিন্ন, আর কিছু ছিল না; সুতরাং পিতা-মাতার আদ্যশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবার কোন উপায়ই ছিল না। এমন কি, হবিষ্যি করিবার ব্যবস্থাও তাহার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভয়, বার বছরের ছেলে, তাহাতে আবার তাহার প্রাথমিক শিক্ষা আদবে হয় নাই, সুতরাং হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান এ৺নও ভালরূপ জন্মে নাই। এরূপ অবস্থায় পিতা-মাতা হারাইয়া, অভয়, নিতান্ত দুরবস্থাতেই পতিত হইলেন। নিশ্চিন্তপুরের অধিবাসীবর্গের অধিকাংশই মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন লোক; তাঁহাদের মধ্যে দুঃখে-দুঃখী, সুখে-সুখী হইবার লোক খুব কম ছিল। এতদ্ভিন্ন মোক্তারের মুহুরী ছিলেন বলিয়া, অনেক সময়ে, গ্রামবাসীদের প্রতিকূলে যাইতে হইত। এই জন্য, গ্রামের অনেক লোকের সহিত অভয়ের পিতার সদ্ভাব ছিল না।

সন্তানগণ জনকজননীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ফলভোগী. হইয়া থাকে, অভয়ের জীবনে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। অভয়, কয়েকদিন নিজ বাটীতেই, কায়ক্লেশে, অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, অনাহারে জীবন রক্ষার আর উপায় নাই, তখন পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া গ্রামবাসী দশজনের নিকট ভিক্ষার্থী

হইলেন। ভগবান, যেন স্বয়ং, সদয় হইয়া, অভয়কে এই উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। অভয়, ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রতিদিন যাহা কিছু পাইতেন, তাহার কতক স্বীয় হবিষ্যে ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকিত, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য রাখিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। পিতৃমাতৃ কার্য্যে অভয়ের আনুরক্তি দেখিয়া, প্রতিবেশী হাবুদত্ত, অভয়ের সহায় হইলেন।

হাবুদত্ত, কায়েস্থ সন্তান; অভয়ের পিতার সহিত তাহার বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, যখন, অভয়, এর দুয়ার, তার দুয়ার করিতে থাকেন, তখন অভয়ের সঙ্গে হাবুদত্তের দেখা-সাক্ষাৎ বড় হয় নাই। হাবুদত্তের মনে মনে, ধারণা হইয়াছিল, অভয়ের সহিত বেশী মাখামাখি রাখিলে, সে তাঁহারই ঘাড়ে চাপিবে। কিন্তু অভয়ের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দেখিয়া, হাবুদত্তের সে ধারণা দূর হইল; অধিকন্তু, অভয় কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেছেন, দেখিয়া, আজ অভয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাইবার আবশ্যক হইল। এতদিন অভয়ের পক্ষ হইয়া একটী কথা বলে, এরূপ একজন লোক ছিল না; কিন্তু হাবুদত্তের বর্ত্তমান আদর-আপ্যায়ন দেখিয়া, তখন তিনি হাতে আকাশ

পাইলেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা তখন হাবুদত্তের হাতেই আনিয়া দিতেন।

মাস পূর্ণ হইল, শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল; হাবুদত্ত পরামাণিক ডাকিয়া ঘাটের বন্দোবস্ত করিলেন; পুরোহিত ডাকাইয়া শ্রাদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ফর্দ্দ ধরিলেন, বাজারের কেনাকাটা আরম্ভ করিলেন,—অভয় আজ, হাবুদত্তকে, পরমাত্মীয় পাইলেন বলিয়াই মনে করিলেন। শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। অভয় তখন কি করিবেন, কাহার আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁহার ভাবনা দাঁড়াইল। হাবুদত্ত তখন, অভয়কে নিজের গৃহ কয়খানি বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন। অভয় দেখিলেন, তিনি নিরাশ্রয়; আপনার বলিতে, এজগতে কেহ নাই। এই অবস্থায়, গৃহ কয়খানি রক্ষা করা, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং হাবুদত্তের পরামর্শে, তাহা বিক্রয় করাই স্থির হইল। ঘর বিক্রয়লব্ধ মূল্য, হাবুদত্তের হাতে পড়িল।

হাবুদত্ত, গৃহবিক্রয়ের মূল্য গ্রহণের পর হইতেই, অভয়ের প্রতি একটু কেমন কেমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন। আজ অভয়কে বলিলেন,—"শ্রাদ্ধের বাবদ গয়লার দেনা রহিয়াছে, ঘি-ময়দার দাম বাকী রহিয়াছে, পুরোহিতের দক্ষিণা এখনও মিটে নাই—

ঘর বিক্রীর টাকায়, এ সব দেনা মিটিল না, তাহার উপর তোমার নিজের খাওয়াদাওয়া,—আমি এ সকল খরচ কোথা হইতে চালাইব।" হাবুদত্তের কথা শুনিয়া অভয়ের মুখ শুকাইয়া গেল—চক্ষে জল আসিল। তখন বুঝিলেন, হাবুদত্ত কেন তাঁহার আত্মীয় হইতে আসিয়াছিলেন, আর কেনই বা তাহাকে তিনি এরূপ নিষ্ঠুর কথা শুনাইয়া মর্ম্মাহত করিতেছেন।

হাবুদত্তের কথা শুনিয়া অভয় আর কোন উত্তর করিলেন না। উত্তরীয় বস্ত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক হাবুদত্তের আলয় পরিত্যাগ করিয়া হুগলী চলিয়া আসিলেন। এখানে অভয়ের এরূপ কোন আত্মীয় ছিল না যে, যাহার আশ্রয়ে যাইয়া তিনি একবেলার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন। হঠাৎ তাঁহার পিতার মনীব, মোক্তারের কথা মনে পড়িল। অনেক সন্ধানের পর তাঁহার সন্ধান করিয়া, সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি, অভয়কে আশ্রয় দিলেন। অভয়, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিলেন। তাঁহার শিক্ষা, তাদৃশ কার্য্যকরী না হইলেও, পিতৃপ্রভুর আশ্রয়ে, একপ্রকার দিনযাপন করিতে লাগিলেন। হতভাগ্যের অদৃষ্টক্রমে, অভয়ের পিতৃপ্রভুও কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কাজেই তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইল।

তাহার পরেই আজ রাধানাথের নিকট অভয়ের প্রথম চাকুরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অভয়, রাধানাথের তামাকের দোকানে চাকরী লইলেন। অভয়ের বয়স এখন সতের বৎসর। কুলীন কায়েতের ছেলে; রঙটিও বেশ ফরসা আছে; চুলে টেরী-বাগান না থাকিলেও, টেরী বাগাইলে দেখাইত ভাল; ইহার উপর যদি, কাল ফিতেপেড়ে শান্তি-পুরে ধূতী, বেলদার পাঞ্জাবী আস্তীনের জামা, ঢাকাই উড়ানী একখানি কোঁচান, কাঁধে থাকিত, তাহা হইলে, মানাইত ভাল। ইহার যদি উপর হাতে একগাছি সরু পীচের ছড়ি থাকিত, তাহা হইলে, সোণায় সোহাগা হইত। ভগবান, নিরাশ্রয় অভয়ের, অযত্নের কচি দেহটিকে, এমন করিয়াই গড়িয়াছিলেন; কিন্তু কে জানে, ভগবানের সেই স্বহস্ত গঠিত পুতুলটি বাক্‌শক্তি পাইয়াও, কথা কহিতে পারিবে না।

যাঁহারা কলিকাতা বেড়াইতে আসিয়াছেন,—বেড়ানর মতন বেড়ান, কলিকাতা বেড়াইয়াছেন,

তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, এই ভদ্রলোক তামাকওয়ালার দোকান, একটি ছোটখাট আড্ডা! এখানে, তুমি, সব শ্রেণীর লোকই পাইবে। গাঁজাখোর, গুলিখোর, মদখোর, আফিংখোর, সিদ্ধিখোর, এইরূপ খোরের দলে যতগুলি নাম আছে, তাহার কোনটিরই অভাব পাইবে না। নব্য ধরণের "কোকেন খোর," এই সকল আড্ডা হইতেই দীক্ষিত হয়। আজি কালি, তামাকের দোকানে, তামাকে যে লাভ হয়, কোকেনে হয় তাহার চতুর্গুণ! বেচা কেনাতেও তত গোলমাল নাই: কারণ কোকেন বিক্রয় করিতে, ঘণ্টায় পঁচিশ বার হাতটিকে জলে ডুবাইতে হয় না; ভেল চালাইবার পক্ষেও সুবিধাজনক মন্দ নয়।

অভয়, মণীব-রাধানাথের টান, একটু বেশী টানেন; তাহার মনের ধারণা,—রাধানাথের দু'পয়সা আয় হইলে, সে সুখে থাকিতে পারিবে; রাধানাথের দু'পয়সা লোকসান হইলে, তাহার দুঃখ হইবে। মনুষ্যের পক্ষে এ ধারণা,—শুদ্ধ সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন লোক ব্যতীত, অন্যের মনে, এরূপভাব উপস্থিত হয় না। কোকেনে, তামাকওয়ালাদের দু'পয়সা জন্মায় দেখিয়া, অভয়ও কোকেন বিক্রির প্রস্তাব করিলেন। ব্যবসার হিসাবে, রাধানাথ, তাহাতে সম্মতি দিলেন। কোকেনে দোকান ভাল চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটি মহা

অনিষ্টের সূত্রপাত হইল; কোকেন বিক্রয় করিতে করিতে অভয়, নিজেও কোকেনের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া বসিলেন, কোকেনে মৌতাত জন্মিল!

কোকেনের মৌতাতে অভয়ের বুদ্ধি-ভ্রম ঘটিল। এখন আর অভয়, সে অভয় নাই; রাধানাথের তামাকের দোকানে, মৌতাতী ছেলেছোকরা, ময়রার দোকানের মাছির মত, দিন রাত্রি, ভ্যান্ ভ্যান্, করে; পান তামাকের খরচে, দোকান ফেল্ হইবার যোগাড় হইল। এদিকে, নিরীহ ভাল মানুষ অভয়ের চাল-চলন, একটু উচু উচু হইল। মাথায়, এন্, সি, গুপ্তের সু-কুন্তলা উঠিল; ঘাড়ের দিকে ছোট এবং সামনের দিকে বড় করিয়া চুল ছাটান আরম্ভ হইল; নাসিকার সহিত, ঠিক্ সমান লম্বা ভাবে, আধখানি বখ্‌রা করিয়া চুল ফিরান অভ্যাস হইল; বিলাতী ধোয়া কালপেড়ে ধূতীও কটিদেশ শোভা করিতে লাগিল! দলে মিশিয়া অভয়, অভয়ে, ছোক্‌রা বাবুগিরির সাক্‌রেদী আরম্ভ করিলেন। রাধানাথ, এতদিন, অভয়ের ব্যবহারে, দোকানটির ভার তাহার উপরেই দিয়াছিলেন; কিন্তু আজি কালি, অভয়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন! দোকানের খাতাপত্র উল্টাইয়া দেখি-লেন, সব ফাঁক্! তহবীলে টাকা নাই—ঘরে মাল নাই; যাহারা সোডা-লিমনেড, বিক্রয়ের জন্য দিয়া যায়,

তাহাদের টাকা পাওনা হইয়াছে; তামাকের মহাজন "চক্রবর্ত্তী কোম্পানী"র নিকট অনেক টাকা দেনা হইয়াছে!

দু'মাসের ছুটি লইয়া, রাধানাথ দোকান চালাইয়া, বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিল্‌জারের চাকরী অপেক্ষা, তামাকের দোকান ভাল; কিন্তু অভয়, তাঁহার সে আশার গুড়ে বালি দিয়াছে! দোকানের অবস্থা দেখিয়া, পাওনাদারের বেজায় তাগাদার চোটে, রাধানাথের ঘরে টেঁকা দায় হইয়াছে! রাধানাথের দোকানে চাবি পড়িল। অভয়, নির্ভয়ে রাধানাথের বাড়ীতে দু'বেলা অন্ন ধ্বংসাইতে লাগিলেন; আর বৈকাল বেলা, চিৎপুর রোডের, গরাণহাটার মোড়ে, মুখার্জি কোম্পানীর তামাকের দোকানে আড্ডা দিতে লাগিলেন। রাধানাথ এতদিন, এক কন্যাদায়ের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; এখন তামাকের দোকান করিয়া, আরও দেনার জ্বালায় জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। কন্যাদায়ের সঙ্গে দেনার দায় জড়িত হইয়া, রাধানাথকে অনাথ করিবার যোগাড় করিয়া তুলিল। এদিকে রাধানাথের গিন্নিরও, চাল চলনটা, তামাকের দোকা-নের পর হইতে, একটু উচু উচুই চলিতেছিল। যে রমণী পাঁচ ছেলের মা হইয়াও, সেমিজের জন্য কন্যাদায় গ্রস্থ স্বামীর উদরের দিকে চাহিতে কুণ্ঠিত, রোজ

রোজ কাঁচা পয়সার মুখ দেখিয়া সে রমণীর চালচলন বাড়িবে না ত কি ?

অভয় যখন, রোজ রোজ দোকান সারিয়া, পয়সার তোড়া লইয়া আসিত, তখন রাধানাথের গিন্নি, মনে মনে,নূতন ফরমাইসের চিন্তা করিতেন। বেনে বৌর বেল-দার জ্যাকেটটীর ফিরান কলারটীর কথা মনে পড়িত ; মৌলিকদের বাড়ীর সেজো গিন্নির বাসী ক্কাচান কাল সরু পাছাপেড়ে সাড়ীখানির কথা ভাবিতে ইচ্ছা হইত ; মিত্রিদের বাড়ীর, বড় বাবুর বড় মেয়ের, কাণের ইহুদী মাকড়ি দেখিয়া মনটা কোঁস্ ফাস্ করিত। এ দিকে হেবো বাগদীর খাঁদা গিন্নির হাতের সরু সরু শাঁখা জোড়াটীর উপরও চক্ষু পড়িত। কোন কোন দিন, রাধা-নাথকে বলিয়া বসিতেন,—মেয়ের বিয়ের জন্য আমার বয়স. আর সক দাঁড়াইয়া থাকিবে না ; মেয়ের বিয়ের জন্য আমার সকের কথাটা একেবারে ভুলিয়া যাইও না। কথা শুনিয়া, রাধানাথের মনে দুঃখ হইত বটে, কিন্তু গিন্নিটী,কিরূপ মাল মসলায় গঠিত,তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনিও বলিতেন,—সেকি কথা! তোমার সক্ আগে, কি, মেয়ের বিয়ে আগে ! তুমি জীবিতা থাকিলে, আর মা ষষ্টীর কৃপা থাকিলে, আর পাঁচ বছরে, আরও পাঁচ সাতটী কন্যাদায়ের রাস্তা খোলসা করিয়া দিতে পারিবে ! ঈশ্বর না করুন, ইতিমধ্যে তুমি যদি

সরিয়া পড়, তাহা হইলে, কাহার অনুগ্রহে আমি অবশিষ্ট জীবনটা কন্যাদায়ের হেপায় হাঁপাইয়া মরিব ?

রাধানাথের গিন্নি, লোকটা এক রকম বেশ সাদা সিদে ছিলেন, তাহার ফরমাইসের কথায় কেহ প্রতিবাদ না করিয়া, তাহার বাপান্ত করিলেও, সে দুঃখিত ছিল না ! রাধানাথ, পঞ্চ কন্যার পিতা হইয়া যে, মাটী খাইয়াছিলেন, এখন তাহা ভাবিয়া উপায় নাই ; গিন্নিটী মনে করেন, পাঁচটি ছেলে যখন মা বলিতে বলিতে আসিয়া কিল্‌বিল্ করে, তখন তাহার ন্যায় ভাগ্যবতী এ জগতে আর কেহ নাই ; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যমহিমায়, রাধানাথের প্রাণ যে আই-ঢাই করিতেছে, সে দিকে খেয়াল করিবার অবসর তিনি পান না। রাধানাথের গিন্নি, লেখা পড়া কতদুর জানিতেন, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু আকারে প্রকারে—ভাবে ভঙ্গিতে,—বলিতে কি, ফরমাইসগুলির কায়দা-কানন দেখিয়াও মনে হইত, ইনি মূর্ত্তিমতী সরস্বতী !! সোয়ামীকে শাসন করা যে শ্রেণীর লোকেরা, আজি কালিকার দিনে, আইন বলিয়া চালাইয়া লইতে প্রয়াসী, আমাদের রাধানাথের গিন্নি অন্য কোন গুণে না হউক, ফরমাইসের হেপায়, সোয়ামীকে জব্দ রাখিয়াবার চেষ্টার গুণে, এই শ্রেণীর একজন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। পাঠক !

সম্ভবতঃ ইহাতেই গিন্নিটির পরিচয় পাইয়াছেন, সুতরাং অধিক টিকা টিপ্পনী অনাবশ্যক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অভয়ের হয়েছে ভাল। প্রথম প্রথম, অভয়, গিন্নিটির হুকুম, খুব পালন করিতেন, এজন্য গিন্নি তাঁহাকে, একটুক ভালও বাসিতেন, এবং এই ভালবাসা হইতেই অভয়. চব্বিশ ঘণ্টা বাহিরে থাকিয়া, দুইবেলা দুটি ভাত মুখে দিবার জন্য রাধানাথের বাড়ী যাইতেন। অভয়ের প্রতি রাধানাথের ভালবাসা, কোকেনের মৌতাতে, দূর করিতে পারে নাই। পরের ছেলের জন্য এত ভালবাসা কেন, তাহা রাধানাথের প্রাণেই জানিত। রাধানাথ, গোপনে গোপনে অভয়ের পর্য্যায় খুঁজিতে লাগিলেন, অভয়ের পিতৃ মাতৃ-কুলের পরিচয় শুনিতে লাগিলেন—সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা রাধানাথ যে মনে প্রাণে করিতেছিলেন, পাঠক! তাহা মনে করিবেন না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে পিতৃ মাতৃ-দায়ের জন্য ততটা না ভাবিলেও চলে; কিন্তু কন্যাদায়ের

জন্য, যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া স্বীয় জীবনটা পর্য্যন্ত পণ করিলেও নিস্তার নাই।

রাধানাথের গৃহিণী বেশ চতুর চালাক লোক। রাধানাথ যে চালে চলিতেছিলেন, রাধানাথ যে চালে অভয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ লইতেছিলেন, রাধানাথের গিন্নি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, আইবুড় সোমত্ত মেয়ে ঘরে, তাহ তে রাধানাথের আয় তেমন নয়; কাজেই, যদি কলে কৌশলে, মানটাও বাঁচে, একুল ওকুল দুকুল রক্ষা পায়, তবে মন্দটাই বা কি! রাধানাথ ভাবিলেন, হাতের পাঁচ, ছাড়া ভাল নয়। যদি শক্তি সামর্থ্যে কুলায়, ত ভালই; নতুবা অভয়কে দিয়া, কুল মর্য্যাদার দীর্ঘ নাসা রক্ষা করিবেন।

অভয়, কোকেনের মৌতাতে পড়িয়া, যে দলে মিশিয়াছিলেন, তাহাতে লোক ছিল ঢের। তাহাদের মধ্যে, বেশ পোক্ত বুদ্ধিমান যে দু'একটি না ছিল, পাঠক এরূপ মনে করিবেন না। এই সকল সেয়ানা, ছোকরারা অভয়কে বলিয়া দিল, রাধানাথের চক্ষু তোমার দিকে, বক্রভাবে আছে। এক দিন—দু'দিন তিন দিন দেখিয়া রাধানাথের মনের ভাব, অভয়ও কতকটা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, আজ অভয়, সকাল বেলা বাহির হইয়া দুপুর বেলা আসেন;

স্নান ক'রে, আয়না চিরুণী লইয়া টেরি বাগান, তাহার পর ভাত খাইয়া নাগরটী সাজিয়া, রাস্তায় বাহির হন। দিনটা এমনি ভাবে যায়, সন্ধ্যার সময় আবার আসিয়া তাতের বখরা লইয়া ইয়ারের দলে হাজির হন। ফল কথা, অভয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—কায়েতের ছেলে ছিলেন বলিয়া এ যাত্রাটা রক্ষা পাইলেন। যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তখন ষোল আনা সুবিধাটুকু সম্ভোগ না করিয়া রেহাই দিবেন কেন ?

কন্যা লইয়া যিনি ঠেকিয়াছেন, তিনিই জানেন, এ ব্যাপারে কতটা মজা আছে! সংসারে মজা অনেক রকম আছে। আতুর ঘর হইতে বাহির হইয়া, মায়ের কোলে যখন মাই খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তখন এক মজা। সে মজা বেশ মজা, আঁধার ঘরের সাপ। তারপর যখন হামাগুড়ি দিতে শিক্ষা করা যায়, তখনকার মজা, আবার নূতন এক ধরণের। যখন হাঁটিয়া উলঙ্গ ননিগোপাল বেশে, আধ আধ স্বরে, পিতা-মাতাকে সম্বোধন করিয়া আব্দার করিবার শক্তি হয়, তখন আর এক মজা। মা-বাপের শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, আমি "আঙা কাপোল নেবো" এই আব্দার শুনিয়া, অনেক পিতা মাতার প্রাণেই ব্যথা লাগে; কিন্তু যে আব্দার করে, তাহার যে মজা, তাহা তুমি আমি অনুভব করিতে পারি না। তোমার

আমার সে সময় যে, অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। সেই আব্দার যে, এখন বিস্মৃতির গভীরতায় নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাহা এখন অনুভব করিতে পারি কি?

ইহার পর কিশোরের মজা। পাঁচ বছর বয়সের সময়, কথা, ষোল আনা ফোটে। হিন্দুশাস্ত্রের হুকুম মানিয়া চলিতে হইলে, পাঁচ বছরে ছেলের হাতে খড়ি দিতে হয়। ছেলে তখন কাপড় চাহিবে, জুতা চাহিবে, আয়না চিরুণী লইয়া টেরী বাগাইতে চাহিবে! এই চাহনীতে যে মজাটুকু আছে, তাহা আর আমরা এখন বুঝিতে পারি না। কিন্তু যাহারা এখন সেই মজার উমেদার, আমরা তাহাদের আব্দার রক্ষা করিতে পারি না বলিয়া, যে মজা পাই, তাহার মজা, আর কেহ বুঝে না। এ কথাটা শুধু ছেলের জন্য নহে, মেয়ের পক্ষেও আজি কালি, প্রযোজ্য; এখন মেয়েটিকেও ছেলের মত লেখা পড়া শিখাইতেও হয়, নতুবা বিয়ে হবে না। ছত্রিশবর্ণ জাতির মনেই এখন এই ভাবটা জাগ্রত। তাই নিতান্ত চাষা পল্লীতেও, এখন একটা বালিকা স্কুল না থাকিলে, আর, সে পল্লীটা মানুষের বাস বলিয়া পরিগৃহিত হয় না।

আজিকালিকার বাজারে বালিকা-শিক্ষার মজাটাও কিন্তু বড় কম নয়। মেয়ের বিবাহ দিবার সময়

হইলে, বরপক্ষের লোকেরা দল বাঁধিয়া আসিয়া মেয়ের পরীক্ষা করে। মেয়ের মুখে যদি শুনে, বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" পড়িয়াছে, আর মেয়ের হাতে যদি রমেশ-চন্দ্রের "বঙ্গবিজেতা" দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, মেয়ের নাসিকার অস্তিত্ব না থাকিলেও, কোন্ দোষ হয় না। মেয়ে দেখিতে আসিলে, কেয়ারী কাটা চুল কিনা, উলের কাজ জানে কিনা, নাটকনভেল কয়খানা পড়েছে, সকল বিষয়ের আগে, সে বিষয়ের খোঁজটা একটু বেশী হয়; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রান্নাবান্নার খবরটা লওয়া, কেহ, আবশ্যক বোধ করেন না! এতদিন, রান্নাবান্নার কার্য্যটাই, স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; অমুক সু-পাচিকা, পল্লী সমাজে এই সকল কথা লইয়াই, ঝি-বউয়ের সমালোচনা হইত। এখন সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে।

ইহার পর, ছেলে-মেয়ের বিয়ের মজা। ছেলে মেয়ে বিয়ে দিলে, তখন তুমি হ'লে, একটী অদ্ভুত জীব! ছেলে বিয়ে দিয়ে বউমার ঘরে আসিলে, লোক-লৌকতার মাত্রা বে'ড়ে গেল। যদি এই লোক-লৌকতা, তোমার অবস্থা অনুসারে, অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন তুমি নীচাদপি নীচ! আর মেয়ের কুটুম্বের সঙ্গে ত কথাই নাই। তোমার অবস্থা যেমনতরই হইক না কেন, সমাজের আইন মত, ন্যায্যগণ্ডা বুঝা-

ইয়া দিতে না পারিলে, তোমার ভদ্রস্থ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক,তোমার মেয়েই, তোমাকে বলিবে,—ক্ষমতা না থাকিলে, মেয়ে বিয়ে দিয়াছিলে কেন? এখন আমার খ্যায্যগণ্ডা বুঝাইয়া দেও, তোমার বাড়ী, আর না হয়, প্রস্রাব করিতে আসিব না।

পাঠক, এই উক্তিটি করিলেন কে, বুঝিলে ত? যে কন্যাকে, তোমার গৃহিণী গর্ভে ধারণ করিয়াছে, যে কন্যা পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর কাল, তোমাকে উপরের লিখিত মজা দেখাইয়া, কান্তিবিশিষ্ঠা হইয়াছে, আজ দশজনের মত একজন হইয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তোমার সেই কন্যাই বলিতেছে,—আমার ঘরসংসার নষ্ট হইল, আমাকে পাঠাইয়া দেও—তোমাদের নিকট দুই দিন থাকিয়া আমার কি লাভ হইবে! এখানে কতদূর স্বার্থপরতা, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে লুক্কায়িত, পাঠক, একবার খেয়াল করিয়াছ কি? যাহাকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া পূর্ণতা জন্মাইলে, সে এখন তোমার আপ্যায়নে ক্ষুণ্ণ! এরূপ নিমকহারামী, নিতান্ত শত্রুতেও বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, বাজে কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন রাধানাথের সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করা ভাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:※:০—

রাধানাথ, এক অভয়ের ভরসায় অনেকটা আশ্বস্ত আছেন; এমন কি, অভয় যদি তাঁহার ঘরে বাঁধা না থাকিত, তাহা হইলে, তিনি আজ ঘরে তিষ্ঠিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এদিকে রাধানাথের আবার নূতন রকমের একটী উপসর্গ ঘটিল। গোকুলদাস যে একশত টাকা দিয়াছিলেন, রাধানাথ, তাহা ফাঁকি দিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। শুদ্ধ কন্যাদায়-গ্রস্ত হইয়া রাধানাথ এপথে পা বাড়াইয়াছিলেন কিনা, তাহা রাধানাথের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন বই, আর কেহ বুঝিতে পারে না। কায়দায় পড়িয়া অনেক রাধা-নাথ. চোর-জুয়াচোর প্রতারক-প্রবঞ্চক, এমন কি, খুনী ডাকাত নাম ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা রাধানাথের অবস্থা যাহা চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বোধ হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া, ঘটকী ঠাকরুণের ডাক না শুনিলে, আজ রাধানাথ. গোকুলদাসকে, একশত টাকা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেন না। গোকুলদাস রাধানাথের নামে বিশ্বাস-ঘাতকতার নালিশ রুজু করিলেন। রাধানাথ ওয়ারেণ্ট গ্রেপ্তার হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতার পুলীশ কোর্ট, ভগবানের সৃষ্টির অতি অদ্ভুত স্থান। যাহারা এই স্থানের পাণ্ডা, তাহারা আরও অদ্ভুত! রাধানাথ যখন গ্রেপ্তার হন, তখনও তিনি জানেন না,—তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে! একজন লালপাগড়ীওয়ালা পশ্চিম দেশবাসী লোক, তাঁহার হাত ধরিয়া লালবাজারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; তিনি যতই হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সে ব্যক্তি ততই জোর করিয়া ধরিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী মৃদুমন্দ ধাক্কাও দিতেছে, আর অতি গুরু গম্ভীর স্বরে বলিতেছে,—"শালা চলোনা তোমারি বাপ্‌কা হুঁয়া, তব্ মালুম হোগা, কাঁহা যাতিহে।"

রাধানাথ তখন ভাবিলেন,—ব্যাপার বড় সোজা নয়! যখন পাহারাওয়ালার মুখ থেকে মধুর সম্ভাষণ বাহির হইতেছে, তখন যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেখানে যাইয়া, হয়ত, ইহা অপেক্ষা আরও মিষ্টি সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতে হইবে। রাধানাথ আর বাক্যব্যয়টি না করিয়া, ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, পাহারাওয়ালাও, পুলীশ কোর্টে হাজির হইল। যেস্থানে সর্ব্বসাধারণের গতিবিধি আছে, রাধানাথের জন্য তদপেক্ষা স্বতন্ত্র একটী কামরা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কামরাটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের একপার্শ্বে অবস্থিত। এখানেও, তেমনতর লালপাগড়ীওয়ালা এক মহাপুরুষ

একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, সাম্‌নে একটী টেবিল, পার্শ্বে দুইখানি বেঞ্চি আছে। এই বেঞ্চির উপরে রাধানাথের শ্রেণীর লোকের বসিবার স্থান।

রাধানাথ, ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ন্যায় ভদ্রবেশধারী আরও দুই চারিজন, বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। ভূম্যাসনেও ১০।১২ জন উপবিষ্ট; ইহাদের পরিচ্ছদাদি দেখিয়া মনে হইল, ইহারা নিম্নশ্রেণীর লোক। ঘরের বাহিরে, কাহারও যাইবার অধিকার নাই; লোহার গরাদে দেওয়া দরজা-জানালা; দরজায় একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রাধানাথ যখন ঐ কামরায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, বেলা তখন দশটা। পার্শ্বের ঘরে হাকিমের এজলাস: এই এজলাসে, কাষ্ঠের মঞ্চোপরি, হাকিমের বসিবার স্থান; সম্মুখে বিস্তৃত টেবিল, তাহার সম্মুখে, মুখোমুখী হইয়া, ইণ্টারপ্রিটার ও কেরাণী বাবুর বসিবার আসন। নিম্নদেশে শ্রেণীবদ্ধ কেদারায়, চিত্র-বিচিত্র শাম্‌লা-শীর্ষক একপ্রকার জীব, মতিরায়ের যাত্রার দলের ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতার ন্যায় আসীন। ইহাঁরা মাজিষ্ট্রেটের আগমনের পূর্ব্বেই আপীশের বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে, উপস্থিত নরনারীর মুখপানে তাকাইয়া, শীকার খুঁজিতে থাকেন। সকল মহাশয়েরাই যে, এরূপ করিয়া থাকেন,

পাঠক তাহা মনে করিবেন না। যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন—যাঁহাদের একটু পসার প্রতিপত্তি হইয়াছে, লাইব্রেরীতে বসিয়া থাকিলেও তাঁহাদের শীকার যোটে; কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করিয়া, সবে শাম্‌লা ধরিয়াছেন,—যাঁহাদের ইজেন্দ চাপকান কাচাইবার পয়সা যোটে না, তাঁহারাই বারান্দায় ঘুরিয়া শীকার অন্বেষণ করেন। আজি কালি এরূপ ছুটো-শীকারীর সংখ্যা খুব বেশী।

এখানে লালপাগড়ীধারী জীবের আমদানী কিছু বেশী। হাকিম আসিবার পূর্ব্বে ইহারাও বারান্দায় পাইচারী করিতে করিতে "শুখার" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। বেলা এগারটা, যখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় হয়, হাকিম বাহাদুর, তখন এজলাসে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার আসন পরিগ্রহ করিবামাত্রই প্রথমে উকীল মহাশয়েরা এক এক খানি চোথা-কাগজ হাতে করিয়া, হাকিমের সম্মুখে দুই একটি কথা বলেন। ইহার পর সেই চোথা কাগজ খানি, ইণ্টারপ্রিটার মহাশয়ের হাতে দিলে, তিনি তাহা হাকিমের সম্মুখে ধরেন। হাকিম তাহাতে Issue Summons অথবা Issue Warrant বলিয়া দস্তখত করেন। এই চোথা কাগজখানার নাম, কলিকাতা পুলীশ কোর্টে, দরখাস্ত। ইহাতে কোর্ট ফি দিতে হয় না।

উকিল দিতে হইলেও ওকালতনামার দরকার নাই; এ একপ্রকার বেশ মজার বন্দোবস্ত! মফস্বলের লোকে, হয়ত, মনে করিবেন,—কলিকাতা আসিয়া একবার ফৌজদারী মোকদ্দমা করিলে, মন্দ হয় না! ফলে কিন্তু তাহা নহে। পাঠক, একটু অপেক্ষা করুন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুলীশ কোর্ট।

—:*:—

হাকিম, এজলাসে বসিয়া, প্রথমে উকীলদের আবদেরে মোকদ্দমা গ্রহণ করেন। ইহার পর যাহা হয়, মফস্বলের পাঠকবর্গ সে বিষয়ে অজ্ঞ; অতএব পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, দুই একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। পাঁচ আইনের মোকদ্দমা কাহাকে বলে, আজিকার বাজারে, মেথর মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত, তাহা অবগত আছে। রাস্তায় মাত্‌লামী করা, রাস্তায় প্রস্রাব করা, গাড়ী রাখিয়া রাস্তা বন্ধ করা প্রভৃতি কতকগুলি বাজে কার্য্যের জন্য, যে সকল নালিশ হয়, সে গুলিকেই পাঁচ আইনের মোকদ্দমা বলে; এ

সকল মোকদ্দমায়, রোজ রোজ, জরিমানা রূপে যাহা আমদানি হয়, ঠিক দিয়া দেখিলে, তাহাতেই, মায় টিকটিকটী শুদ্ধ, হুজুর আপীশের বড়কর্ত্তার তন্‌খা আদায় হইয়া যায়! বিচার মহিমা কি চমৎকার, তাহাও একবার শুনুন। সহরের কি থানায়, প্রতিদিন এই সকল মোকদ্দমার একখানা তালিকা বই, লালবাজারে প্রেরিত হয়; এই সকল তালিকা, প্রথমে, পুলীশ কমিশ্‌নার সাহেবের নিকট পেশ হয়; তিনি স্বয়ং, কাটকুট বাদ দিয়া, যাহা বাকী থাকে, তাহাই মাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠান; সুতরাং আমাদের কর্ণগোচর হয়। মাজিস্ট্রেটের নিকট যখন থানার এই সকল পাঁচ আইনের খাতা দাখিল হয়, তিনি তখন কালীঘাটের পাঁটা কাটিতে আরম্ভ করেণ। যদি কোন দিন সাড়ে এগারটা কি দুপুরের সময়, কোন পাঠক, অনুগ্রহ করিয়া পুলীশ কোর্টে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবেন. একজন লালপাগড়ীওয়ালা নিজের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া হাঁকিতেছে,—"রামশুক গাড়োয়ান আসামী হাজির হ্যায়, রামসুখ গাড়োয়ান আসামী।" এই হাঁক শেষ হইতে না হইতেই নিতান্ত জীর্ণ ও মলিন বেশধারী রামশুক, এক গাছা চাবুক হাতে করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এজলাসের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। একজন পাহারাওয়ালা ডান হাতে, সে বেচা-

রীর বামহাত ধরিয়া, এক ধাক্কায়, আসামীর কাট্‌রায় পূরিল। লোকটির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল,—সে মনে করিয়াছে, এ আবার কোথায় আসিলাম! ইণ্টারি প্রিণ্টার মহাশয়, তখন ভারি ব্যস্ত; কারণ, ঘণ্টা-খানেকের ভিতর তাঁহাকে অনেক রামশুকের সপিণ্ডকরণ করিতে হইবে। তাই ইণ্টারপ্রিণ্টার মহাশয়, তাড়াতাড়ি রামশুককে হলপ পড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাস্তামে পেসাব কিয়া।" রামশুক কথার কোন উত্তর দিবার সুবিধা পাইবার পূর্ব্বেই, হাকিমের মুখ হইতে বাহির হইল,—"Eight Annas" অর্থাৎ আট আনা! তখন একজন পাহারাওয়ালা, এক ধাক্কা দিয়া সেই গরাদে দেওয়া দরজার ভিতরকার কক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল,—"আট আনা!" পাঠক, কিছুকাল পূর্ব্বে আপনারা দেখিয়াছেন যে, এই কক্ষে একজন পুলীশ কর্ম্মচারী চেয়ারে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে একটী টেবিল রহিয়াছে। এই মহাপুরুষটী, পুলীশ কোর্টের জরিমানার তহশীলদার! পাঁচ আইনের কৃপায়, এইরূপ যে সকল মোকদ্দমা দায়ের হয়, কারণ অনুসন্ধান করিলে, বুঝা যায় যে, এ সকল মোকদ্দমার প্রায় তিন ভাগের একভাগ সাক্ষান মোকদ্দমা। লোকের এ ধারণা কেন, তাহাও একটু খুলিয়া বলা ভাল।

কলিকাতার অনেক রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে লেখা আছে,—"Comit no nuisance" এখানে প্রস্রাব করিও না।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় যে, লোকে সেখানেই প্রস্রাব করে। এই সকল রাস্তায় যে পাহা ওয়ালা পাহারা দেয়, নিরীহ লোককে ঐ সকল স্থানে প্রস্রাব করিতে দেখিলেই, গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। থানার কর্ত্তারা পাহারাওয়ালাকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে করিয়া,তাহার কথাই বিশ্বাস করেন; সুতরাং বেচারীকে জামীন দিয়া, তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হয়। অতঃপর যাহা ঘটে, তাহা রামশংকের ঘটনাতে ই জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপে, পাঁচ আইনের দোহাই দিয়া, রাস্তা বন্ধ করিবার অপরাধে গরুরগাড়ীর আড়োয়ান,—পথে ফল বিক্রয় করিতে বসিয়া, রাস্তা বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া, ফলওয়ালী প্রভৃতি, পাহারাওয়ালাদের অনুগ্রহে, কিছু কিছু লালবাজার-সেলামী দিয়া থাকে। শুধু ইহারা নহে, মদ খাইয়া রাস্তায় বাহির হইলে, যদি পাহারাওয়ালারা টের পায়, তবেই তাহারা সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ সেলামীর দাবী করে। "মাতালস্য নানা ভঙ্গী," নবাবী মেজাজ একটু চড়া হইয়া উঠে; তখন আর তাহার নিস্তার নাই। পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক, রাস্তায় মাত্‌লামী করিয়াছে, বলিয়া,

থানায় লইয়া যায়। মাতাল অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য, তখন, থানার কর্ত্তারা, মুখের গন্ধ গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন। এই সকল অপরাধীর বিচার কালে, সত্য সত্য রাস্তায় মাতলামী করিয়াছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরও, এই সকল পাহারা-ওয়ালাকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে করিয়া, অপরাধীর অবস্থা অনুসারে, আট আনা হইতে, পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত, জরিমানা করিয়া নিষ্কৃতি দেন।

যাহা হউক, এইরূপে, বাজে মোকদ্দমাগুলি শেষ হইবার পর, রাধানাথকে, একজন পাহারাওয়ালা, হাত ধরিয়া নিয়া, আসামীর কাটরায় দাঁড় করাইল। মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, রাধানাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, লোকটা ভদ্রবংশসম্ভূত! রাধানাথের পাঁচশত টাকা জামীনের হুকুম হইল। রাধানাথের আত্মীয় স্বজন এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার জামীন হয়। একজন মাড়ওয়াড়ী অনুগ্রহ করিয়া রাধানাথের জামীন হইলেন, রাধানাথ, সেদিনকার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাড়ী চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

—:*:—

যে কন্যাটীর বিবাহ উপলক্ষ করিয়া, আজি রাধানাথ, চক্ষে ধূঁয়া দেখিতেছেন, সে কন্যাটীর নাম তিলোত্তমা। রাধানাথের সন্তানের মধ্যে প্রথমা বলিয়া ইহাকে সকলে খুব আদর করিত, সেই আদর হইতে ইহার ডাকনাম ছিল "আদুরী"। আদুরীর বয়স এখন পূর্ণ চতুর্দ্দশ। আদুরী এখন সব বুঝিতে শুঝিতে পারিতেছে, বাপের কষ্ট বুঝিতেছে—মায়ের সকের সেমিজের আব্দার বুঝিতেছে—অভয়ের প্রতি মা-বাপের আদর-আপ্যায়ন কেন, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে পারিতেছে না।

আদুরী কায়েতের ঘরের মেয়ে, সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়াছেন, এরূপ নহে, তাহার উপর বট-তলার সরস্বতীর কৃপায়, আজি কালি, যে সকল নাটক নভেলের জন্ম হইতেছে, আদুরী, তাহা প্রায়ই উদরস্থ করিয়াছেন। আদুরী—"প্রণয়-পত্রিকা" বা "দাম্পত্য সোহাগ" পাঠ করিয়া, প্রণয়ের অঙ্কুর হৃদয়ক্ষেত্রে পুতিয়াছেন; চিঠিপত্র লিখিবার কেহ না থাকিলেও, কাগজ কলম লইয়া আপনার মনে চিঠি লিখেন, ভাবী

প্রণয়ীর উদ্দেশে আপনার মনের ভাব চিত্রিত করিয়া, চিঠির মুসাবিদা করেন, আর টুক্‌রাটুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। প্রতিবেশী মুখুয্যে বাবুর মেয়ে বিনোদিনীর স্বামী, বিনোদিনীকে পত্র লিখেন, তাহা শুনিয়া,—স্বামীর পত্র দেখিয়া, ফোঁস্ ফোঁস্ করেন, মধ্যে মধ্যে লুকান দীর্ঘ-নিশ্বাসের একটু একটু মৃদু হাওয়াও বহিতে দেখা যায়; সঙ্গে সঙ্গে দুই এক বিন্দু অশ্রুবিন্দুও টপ্ টপ্ করিয়া সেই মৃদু নিশ্বাস-বাত্যায় বারিবিন্দুর অভাব পূরণ করে।

আদুরীর সহিত বিনোদের খুব প্রণয়। পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করেন, সুতরাং ছেলেবেলা হইতে, ছাদের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া, দুইজনে, নিয়তই এক সঙ্গে খেলা করা, একসঙ্গে লেখাপড়া করা, একসঙ্গে নাটক নভেল পড়া; এক কথায়, বর্ত্তমানকালের মেয়েদের, বিবাহের পূর্ব্বে, যে সকল উপক্রমণিকার দরকার, আদুরী সমস্তই করিতেন। উভয়ে ঠিক সমবয়স্কা হইলেও, বিনোদের বিবাহ আগে হইল। বিনোদের পিতা সওদাগরী আপীশের বড় চাকুরে; মোটা বেতন পান, কাজেই কন্যার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে বড় বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। বিনোদের বয়স যখন দশ বছর, বিনোদের পিতা মুখুয্যেবাবু, তখনি বিনোদের বিবাহের চেষ্টা করেন। যাহার

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না থাকে, তাঁহার ভাগ্যে সহজে, যোটেও ভাল। মুখুয্যেবাবুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বি, এ পড়ো একটী ছেলের সহিত বিনোদের বিবাহ-স্থির হইল। বিনোদের বিবাহ হইল, বিনোদ শ্বশুরবাড়ী গেলেন।

বিনোদের বিবাহের প্রস্তাব হইতেই, আদুরীর মনে, বিবাহের কথাটা একটু একটু করিয়া জাগিতে থাকে। সাথের-সাথী, খেলার-সাথী বিনোদের বিবাহ হইল, তাঁহার বিবাহের কথা তখনও, কেহ তুলেন না; সুতরাং আদুরীর মনটা একটু কেমন কেমন হইল। কিন্তু কি করেন, কিছু করিবার সাধ্য নাই। মনের ভাব মনেই লুকাইতেন—মনের কষ্ট মনেই থাকিত, বলিবার কেহ ছিল না; সুতরাং কাহাকেও বলিয়া মনের বোঝা হালকা করিবার সুবিধা পাইতেন না।

আদুরী, রাধানাথের আদরের মেয়ে; সাদাসিদে লেখাপড়া শিখিয়া, ঘরে বসিয়া, এখনকার কালের মেয়েদের ন্যায়; নভেলী-বিদ্যায় বেশ পাকাপোক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রাধানাথের অবস্থা ভাল ছিল না; বাড়ীতে ঝি-চাকরাণীর বন্দোবস্ত ছিল না, সুতরাং আদুরীর সহচরী হইবার লোকও কেহ ছিল না। আজিকালি বার বছরে, মেয়েরা পাকে। তাহারা সব বুঝে, সব বলে; সব বুঝিয়া, পিতা-মাতার সঙ্গে ঝগড়া

করে—নবশিক্ষার পরদার আড়ালে, কেবল একটী কথা বাদ রাখে; পাকে প্রকারে, তাহাও যে খোলসা না হয়, এরূপ নহে। আদুরী, ঠিক তেমনটী হইবার সুবিধা না পাইয়া থাকিলেও, চৌদ্দবছরে আইবুড় মেয়ে ঘরে রেখেছেন বলে, মনে মনে বাপের বাপান্ত করিতে ছাড়েন না! মনের কথা মুখে বাহির হইতে চায়, কিন্তু বাহির করেন না! কাগজে কলমে তাহা চিত্রিত হয়, আর তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া নদ্দমায় যায়। মনের তাপ—মনের জপ, সব সেই নদ্দমা দাখিল হয়।

প্রতিবেশী বাল্য সহচরী বিনোদের বিবাহ হইয়া গেল, আজ দু'বছর; আদুরীর বিবাহের সাড়া নাই! কাজেই আদুরীর মনে হইল, আইবুড় দোষ বুঝি তাহার ঘুচিল না! আদুরী, সত্যসত্যই একটু উতলা হইলেন। আদুরীর মা, আদুরীর মনের ভাব, একটু একটু বুঝিতে পারিয়া, বিনোদকে, দিনের ভিতর তিন-বার নিজের বাড়ীতে আনেন, আদুরীর সঙ্গে গল্প সল্প করিতে বলেন; বিনোদ, বড় বাপের মেয়ে; কাজ কর্ম্ম করিতে হয় না, কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না; সর্ব্বদা আদুরীর কাছে আসিয়া দুই জনে একটী ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া নিজেদের কথাবার্ত্তা বলেন। বিনোদের সোয়ামী, বিনোদকে যে সকল চিঠি পত্র লেখেন, তাহা দুইজনে মিলিয়া পাঠ করেন। আবার বিনোদ, সোয়ামীর

কাছে যে চিঠি লেখেন, সেখানে বসিয়া তাহার মুসাবিদা হয়; ঘরে বসিয়া দুজনে এ সকল খেলাই খেলিয়া থাকেন। বিনোদের তাহাতে বেশ ফূর্ত্তি আছে। কিন্তু আদুরী, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন, আর মুখখানি কাল করিয়া, আপন মনে কি ভাবেন। বিনোদ, সোয়ামীর নিকট চিঠি লিখিবার সময় "প্রিয়তম" পাঠ দেখিয়া আদুরীর মন ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠে। শিক্ষা ও সহবাসে, কোমল-বালিকা হৃদয়ে যে বিষের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে, তাহা একটু একটু করিয়া মুকুলিত হইতেছে, এরূপ আভাস পাওয়া যায়। আদুরীর অবস্থা, বিনোদ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন—আদুরীর মা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন—আদুরীর বাপ রাধানাথও বেশ বুঝিতে পারিতেছেন; কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতে-ছেন না—কিছু করিতে পারিতেছেন না. তিনি অর্থ হীন!

বর্ত্তমান সময়ে, যাহাদের পয়সাকড়ির সম্ভাবনা আছে, তাহারাই নাটকী-নভেলী স্ত্রীশিক্ষার নামে মূর্চ্ছা যান। চল্লিশ বছর বয়সের পত্নী, দশ ছেলের মা হইলেও, মাথায় পমেটম দিয়া, ফ্রেইলদার জ্যাকেট ও ব্রাহ্মিকা ক্যাপে বপুখানি সাজাইয়া, বাজারে বাহির করিতে অনেক মিন্‌সের ষোল আনা সাধ। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া, অনেক গিন্নির, বুড় বয়সে, আপনা আপনিই, সাধটা যেন চাগাড় দিয়া উঠে। শুধু পোষাক পরিচ্ছদ

আর কেশ-বেশ-বিন্যাসে নহে; আগে পাছে, চাল চলনের যত রকম কায়দা-কানন,বর্ত্তমান সময়ে, অবারিত নেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সব কয়টীতেই, তাহাদের বেশ খরদৃষ্টি পতিত হইতেছে। লোকের মুখের দিকে চাহিয়া—লোকের কথায় ভয় করিয়া, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছে না; কিন্তু পাকে প্রকারে ইচ্ছাটা যেন,—তাহারও তেমনটি করিবার সুবিধা হইলে ভাল হইত। তাই, কোন কোন মেয়েওয়ালী, আপন আপন সোয়ামীবর্গকে বলেন,—"এখনকার কালে, এখনকার মেয়েদের চালচলন ত নূতন ধরণে হয়েছেই; সেমিজ-কামিজ, বডি-জ্যাকেট, তা'দের এখন না হ'লে আর ভাল দেখায় না। খোস্‌বয়ওয়ালা তেল, মাথার খোঁপায়, "মনেরেখ" মটো লেখা চিরুণী, ছবি আঁকা চিঠির কাগজে চিঠি লেখা, এখন নিত্য নৈমিত্তিক সাজ-সজ্জার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।" এতদ্দিন, সিন্দুরের ঝাপির ভিতর আয়না, চিরুণী, সিন্দুরের কৌটা, টিপ পরিবার ছাঁচ থাকিত; এখন সেই ঝাপির ভিতর, ব্রুশ, আয়না, হ্যাণ্ডলওয়ালা কোম্ব, টুথব্রাস, আর তার আনুসঙ্গিক সচিত্র চিঠির কাগজ, ষ্টীলপেন, লেডপেন্সিল, ডাক টিকিট ইত্যাদি। কোন কোন গিন্নি, এসকল দেখিয়া শুনিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিতে ছাড়েন না।

পাঠক, একবার সমাজটার প্রতি চক্ষু মেলিয়া দেখুন দেখি, আজ ইহা কি অবস্থায় দাঁড়াইতে চলিয়াছে! যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নিকট পত্রাদি লিখিতে হইলে, "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিত; আজ সেই "শ্রীচরণেষুর" স্থলে "প্রিয়তম" "প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি প্রণয়ের পাঠ বিরাজমান! যে স্বামী এতদিন আরাধ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হইত, আজি কালি, সেই স্বামী ইয়ারের দলভুক্ত। যে অবগুণ্ঠন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার একমাত্র আবরণ ছিল, আজিকালি সেই অবগুণ্ঠন মস্তকের বার আনা স্থান হইতে বেদখল হইয়া, পশ্চাদ্ভাগে, নিতান্ত সন্তর্পণে আছে! লজ্জাশীলতা, এই সুবিধা পাইয়া, অনেকদিন হইতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। কথাগুলি অনেক পাঠকের মুখরোচক হইবে না, আমরা ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। এ স্থানটি পাঠ করিয়া, অনেক পাঠক, গ্রন্থ-কর্ত্তার বাপান্ত করিতেও ছাড়িবেন না, তাহাও বুঝি; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় জীবনে, এসকল বিষয়ে যে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা সাধারণের নেত্রগোচর করিতে যদি, কাহারও মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তিনি নিরুপায়।

বলি, একদিন যে রীতি নীতি, যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদ, যেরূপ সাজ গোজ, স্ত্রীলোকের জন্য প্রচলিত

ছিল, তাহাতে কি সভ্যতার অঙ্গে কালি পড়ে? তাহাতে কি সভ্যতা রক্ষা হয় না? এতদিন পিতা-মাতার সাক্ষাতে—শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্ষের উপর, প্রৌঢ়ারাও স্বামীকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইত; বল দেখি, এখন তোমরা সেই ব্যবহারটিকে কি করিয়া তুলিয়াছ? এখন তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর বর্ষীয়া স্ত্রী, তোমার প্রশ্রয় পাইয়া, তোমার অনুষ্ঠিত কুশিক্ষার প্রশ্রয় পাইয়া, কতদূর নির্লজ্জা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছ কি? তুমি এখন শিক্ষা দিতেছ—তোমার প্রশ্রয় পাইয়া, এখন তোমার সেই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রী, তোমাকে দেখিবামাত্র, কি করিয়া তোমার সহিত আসিয়া দুইটা প্রণয়ালাপ করিবে—দুইটা ফরমাইশের কথা কহিবে, তাহার জন্য এদিক্ ওদিক্ দিয়া উঁকি ঝুকি মারিয়া থাকে। যদি বৃদ্ধা পিতামহী, মাতামহী অথবা কনিষ্ঠা ভগ্নী প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহাদিগকে দূতীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তোমাকে তলপ না করিয়া ছাড়ে কি? তখন তোমার পিতা, মাতা, ভাই প্রভৃতি শত শত অভিভাবক উপস্থিত থাকিলেও, সেই চৌদ্দ বছুরীর বে-আদবীর কাছে, তোমাকে হার মানিতে হইবে; আর তোমার মুরব্বীদিগকে, হয় ঘাড় হেট করিয়া থাকিতে হইবে, না হয়, সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পালাইতে হইবে।

এ সব দেখা সাক্ষাৎ উপলক্ষে, প্রণয়ালাপে অথবা কাজের কথায়, কোনরূপ লজ্জাশীলতার চিহ্ন আছে বলিয়া কেহ বলিতে পার কি ? তুমি অপরাহ্ন পাঁচটার সময় তোমার শ্বশুরালয় যাইয়া উপস্থিত হইলে ; হয়ত, তিনঘণ্টা পরেই তোমার সহিত তোমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইবে। সাক্ষাতের সময়—তোমাদের যাহার যাহা কিছু বলিবার থাকে,—যাহা কিছু পরামর্শ করিবার থাকে, তাহা অনায়াসে করিতে পার, তাহাতে তোমাদিগকে কেহ কোন কথা বলিবার সুবিধা পাইবে না ; কিন্তু তোমরা তোমাদের দাম্পত্য প্রেমের এতদূর বাড়াবাড়ি দেখাইতে চাও যে, তোমাদের আর ঐ তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার জন্য ধৈর্য্য থাকে না ! শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইবামাত্রই, স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে না পারিলে, যেন, আর সভ্যতা রক্ষা হইল না—দাম্পত্য প্রেমের বাঁধুনী ঢিলা হইয়া গেল ! এদিকে যে তোমাদের দাম্পত্য প্রেমালাপের তাড়নায়, শ্বশুর বেচারীর কাণে তালা লেগে যায়,—শ্বশুর বেচারী পালাইবার পথ পায় না, তাহা একটীবার ভাব কি ? যদি তোমরা তাহা ভাবিতে, যদি তোমরা তোমাদের এই ঔদ্ধত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতে, তাহা হইলে, তোমাদের "আজ সেমিজ কামিজের জন্য, নাটক-নভেলের জন্য, আতর গোলাপের জন্য ভাবিয়া

ভাবিয়া কার্য্যস্থলে আধপেটা খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাধানাথ জামীনে খালাস হইয়া কি অবস্থায় কাটাইতেছিলেন, পাঠক তাহা সহজে অনুভব করিতে পারিবেন না, এজন্য একটুকু খোলসা করিয়া বলিতে হইতেছে। কলিকাতা পুলীশ কোর্টের সহিত রাধানাথের এই প্রথম দেখা সাক্ষাৎ। ফলে, পুলীশ কোর্টের যেরূপ কাণ্ডকারখানা, তাহাতে, এই স্থানের সহিত লোকের দেখা সাক্ষাৎ যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

রাধানাথের নামে যে অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, আইন অনুসারে তাহার জামীন নাই; কিন্তু যে হাকিমের নিকট মোকদ্দমা, তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও, হৃদয়টা দয়া দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। রাধানাথকে দেখিয়াই ভদ্রসন্তান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল এবং এই মোকদ্দমায় কোনরূপ কারসাজী আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল বলিয়াই, আইনের বিধি লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাধানাথকে জামীনে খালাস

দিলেন। যখন জামীনের আদেশ হয়, তখন রাধানাথের প্রতিপক্ষের উকীল অনেক প্রতিবাদ করিলেন; তিনি বলিলেন,—"আইনে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অভি-যুক্ত ব্যক্তিদিগের জামীন লইয়া ছাড়িয়া দিবার বিধি প্রচলিত নাই।" বলা বাহুল্য, এই উকীলটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু; ওকালতী করিয়া বেশ পসার প্রতিপত্তি জমিয়াছে, দু'পয়সার সংস্থানও হইয়াছে; কিন্তু হাকিম বাহাদুর, উকীল বাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আইনের বিধান মতে সকল সময়ে সকল ঘটনায় কার্য্য করিলে, অনেক সময় অবিচার করা হয়, ইহাই আমার বিশ্বাস। অধিকন্তু আসামীর চেহারা দেখিয়া বোধ হয়, লোকটী নিতান্ত সরল এবং ভদ্রবংশসম্ভূত। আমি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ না পাইলে, এরূপ অবস্থাপন্ন লোককে ফাটকে রাখিতে পারি না।"

মাজিষ্ট্রেটের আদেশ শুনিয়া উকীল মহাশয় একটু লজ্জিত হইলেন। সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, ন্যায়ের প্রতিকূলে কথা বলিতে হইবে,—সেই কথা সমর্থন করিবার জন্য আবার দুইটা প্রমাণের যোগাড়ও করিতে হইবে; যে ব্যবসার ইহাই মূলমন্ত্র, সে ব্যবসা, নিতান্ত জঘন্য বলিয়াই তখন তাঁহার মনে হইল; কিন্তু অর্থ বড় বালাই! এই অর্থের একটা সীমানা সরহদ্দ, ওকালতী ব্যবসায় ঠিক নাই, এজন্যই

উকীলদের উপর, সাধারণের একটা ঘোরতর বিদ্বেষ আছে। এই মহানগরী কলিকাতায়, কোন্ জিনিশের অভাব আছে, অথবা কোন প্রকৃতির লোক দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি বলিতে সক্ষম নহি। এস্থলে উকীল শ্রেণীর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আমরা তদ্বিষয়ে দুই একটা কথা বলিব, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু ধৈর্য্য ধরুন।

ফৌজদারী মোকদ্দমা যেরূপ বিশ্রী, ভদ্রলোকের পক্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমা যেরূপ নিন্দনীয়, অবস্থা দেখিয়া, আমাদের বিশ্বাস হয়, ফৌজদারী আদালত সম্বন্ধীয় আইনজীবি মহাশয়েরাও তদনুরূপ ঘৃণ্য! আমাদের মন্তব্য শুনিয়া উকীল মোক্তার মহাশয়েরা, সম্ভবতঃ একটু চটিবেন; কিন্তু চটুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে ভদ্রসন্তানগণের পক্ষে, যে সকল কার্য্যগুলি, নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, ব্যবসা অথবা পয়সার খাতিরে, সেগুলির অনুষ্ঠান না করিলে, ব্যবসা চলিতে পারে না, আমরা একথা স্বীকার করি না। দুই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা স্বীয় উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

মফস্বলবাসী পাঠক বৃন্দের মধ্যে অনেকেই জানেন, ফৌজদারী কোর্টের মোক্তার মহাশয়দের কর্ত্তব্যই বা কি,

আর তাঁহারা করেন-ইবা কি! মফস্বলের খাস সহর বাদ দিলে, মহকুমার মোক্তার মহাশয়দিগের আপীশ, প্রায়ই, বটবৃক্ষ মূলে, শিমুলবৃক্ষ মূলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত। একখানি নাতি দীর্ঘ তক্তপোষের উপর একখানি ছেড়া মাদুর অথবা ছেড়া পাটি; তদুপরি একটি মৃণ্ময় মস্যাধার এবং ময়ূরপুচ্ছের লেখনী আছে। মস্যাধারের সহিত সংলগ্ন একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ বালুকা আছে, লিখার পর, এই বালুকা দ্বারা ব্লটিংএর কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ময়ূরপুচ্ছের লেখনীটি, গড়ুর পক্ষীর ঠোঁটের ন্যায় হাঁ করিয়া আছে! যদি কখনও, কালে ভদ্রে নামটা সই করিবার দরকার হয়, তাহা হইলে, ঐটী দ্বারাই কার্য্য শেষ হয়। মোক্তার মহাশয়ের প্রতিপালিত আরও একটি জীব আছে: আদালতী ভাষায় ইহাকে মুহুরী বলে। এই সকল মুহুরীরা কলির সদাশিব অবতার। ইহারা এ জগতে অনেক কার্য্যই করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন; ইহারা মোকদ্দমা গড়িতে পারেন, পিটিতে পারেন, ভাঙ্গিতে পারেন;—এক টাকার স্থলে দশ টাকা খরচ করাইতে পারেন, মক্কেলের অভিযোগের মর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্য মর্ম্ম সংযোগ করিয়া মোকদ্দমা বেশ পাকাইতে পারেন,—কাণে কলম গুঁজিয়া কাছারি-ঘরের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে পারেন—আর

পারেন,—মক্কেলের মোকদ্দমায় এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা খরচ করাইবার সুবিধা করিতে।

মফস্বলের মোক্তার মহাশয়দিগের এরূপ এক একটি মুহুরী আছে; ইহারা, মোক্তার মহাশয়দিগের প্রধান যন্ত্র। যে মোক্তারের মুহুরী নাই, সে মোক্তারের অন্নও নাই। ছেড়া চাপকান, আরদালীর ন্যায় পাগ্‌ড়ী দেখিয়াই অনুমান হয়, এ মোক্তার মহাশয়, শুধু আসেন আর যান; আর এজলাসে বসিয়া যাবর কাটান। কলিকাতা পুলীশ কোর্টে ঠিক্ এরূপ না থাকিলেও, অনেকটা মফস্বলের মোক্তারদের সহিত মিলে।

পুলীশ কোর্টে মোকদ্দমা যেমন বিদ্‌ঘুটে, মোকদ্দমার চালক উকীলও তেমনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায়, প্রতি বৎসরে উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধির কমুব নাই। কেহ কেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের, এই উকীলপ্রসবিনী শক্তি, একটু সংযত না হইলে, আর সৃষ্টি রক্ষা হয় না! ফলে, কথাটাও ঠিক বটে। আজকাল উকীলমোক্তারের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, মক্কেল যোটা দায়: সুতরাং এই সকল উকীলমোক্তার মহাপ্রভুরা, মোকদ্দমা জন্মাইয়া লয়েন। কোন ঘটনায়, মোকদ্দমার হেতু নাই, কিন্তু পাকে প্রকারে, হেতুর সমাবেশ করিয়া, একটী মোকদ্দমা বেশ পাকাইয়া,

মক্কেলের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া দেন। মক্কেল মহাশয়েরাও, একটু হাওয়া পাইলে, আর অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন না; গৃহিণীর হাতের তাগা, পুত্রবধূর হাতের বালা, নববধূর গলার হেশো বাঁধা দিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। যখন দেখেন, আর বাঁধা দিবার কিছু নাই, ঘটীবাটী শুদ্ধ টান পড়িয়াছে, তখন উকীল মহাশয়দিগের কাছে আর বেশী যেসাঘেসি করিতে দেখা যায় না। উকীল মহাশয়েরাও, যখন দেখেন, মক্কেলের রস প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন মক্কেলকে উপদেশ দিয়া বলেন,—মোকদ্দমাটা মিটাইয়া ফেলাই ভাল! পাঠক আপনাদের চক্ষে এরূপ ঘটনা পড়ে নাই কি? আর, পাঠকদিগের মধ্যে যদি কোন উকীল-মোক্তার থাকেন, তবে বলিতে পারেন কি যে, তাঁহাদের দ্বারা এরূপ রঙ্গের অভিনয় কখনও হয় নাই?

যাহা হউক, রাধানাথ, তখন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল উকীলের ওকালতী হেপা না থাকিলেও, উকীলের ওকালতী কায়দায় তাঁহাকে জেরবার করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। রাধানাথ তখন, গত্যন্তর না দেখিয়া, মনে করিলেন,—ফরিয়াদী মাড়োয়াড়ী তাঁহার বন্ধু ছিলেন, তাঁহার প্রতি মাড়োয়াড়ীর কৃপাদৃষ্টি ছিল; অতএব তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলে, কতকটা সুবিধা হইতে পারে। রাধানাথ এই কথা

মনে করিয়া, একদিন মাড়োয়াড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় অবস্থা সমস্তই বলিলেন; মাড়োয়াড়ী, রাধানাথের অবস্থা শুনিয়া, মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন,রাধানাথ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

রাধানাথ গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের ধুক্‌ধুকি দূর হইল না। কয়দিন পুলীশকোর্টে যাইয়া যেরূপ ভাবগতিক দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছে,—"বেল্লিকের নিমন্ত্রণে না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।" সারা রাত্রি ঘুম হইল না, রাধানাথ ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। রাধানাথের গৃহিণী, তখন রাধানাথের এ অবস্থা দেখিয়া, বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—কেন জ্যাকেটটী আনিয়া দিবার কথা, কাল, তাই বুঝি ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে? না হয় না-ই দেবে, তার জন্য আর এত নক্‌রা ছক্‌রা কেন? তোমার সাত পুরুষের সৌভাগ্য ছিল, তাই আমার মত মাগ পেয়েঁছিলে; আমি অন্যের মত হইলে, ঝাটার চোটে মাথার চুল, এতদিনে উঠে যেত।"

রাত্রি প্রভাত হইল; আজ রাধানাথের মোকদ্দমার দিন; ঠিক এগারটার সময় পুলীশে হাজির হইতে হইবে। রাধানাথ গিন্নিকে বলিলেন,—"আজ পুলীশে যেঁতে হবে, সকাল সকাল চাট্টি ভাত পেলে ভাল হয়।" গিন্নি ঠাকরুণ জ্যাকেটের জ্বালায় মনটা ভারি করিয়া,

ছোট মেয়েটাকে কোলে লইয়া, কপাটে ঠেশ দিয়া মাই দিতেছিলেন, রাধানাথের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি পুলীশে যাও, বা জেলে যাও,তাতে আমার কি ? যদি আমার একটা আবদারই, সোয়ামীর কাছে না রইল, তবে তেমন সোয়ামী নিমতলা যাক্ না কেন।" গিন্নীর কথা শুনিয়া রাধানাথের শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিলেন না; মনে মনে স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন,—বাবা বড় সাধ করেই আমাকে সোণার হার গলায় পরাইয়াছিলেন, এখন সেই হার আমার গলায় ফাঁস লাগাইতেছে।

রাধানাথের খাওয়া ঘটিল না; গিন্নি রাঁধিলেন না, সুতরাং অনাহারেই পুলীশ কোর্টে দৌড়াইলেন। পথে তাঁহার মনে, কতরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা স্বয়ং ভগবান বই আর কেহ জানিতেন না। একে চৌদ্দ বছুরী আইবুড় মেয়ে ঘরে, তার বিয়ের যোগাড় হয় না; তার উপর আবার পুলীশ কোর্টে বিশ্বাসঘাতকতার মামলা মাথার উপর ঝুলিতেছে! যদি অভিযোক্তা মাড়ওয়াড়ী সত্য সত্যই না ছাড়ে, তবে হয়ত, জেলে যাইতে হইবে; অতএব কন্যা-বিবাহে ভয়ানক বাধা পড়িবে, সমাজে মুখ দেখান দায় হইবে। ইত্যাকার নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রাধানাথ পুলীশ

কোর্টের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; যখন পুলীশ কোর্টের দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা কোথায় কি ভাবে ছিল, রাধানাথই বলিতে পারেন; কিন্তু যখন এজলাসে যাইয়া দেখিলেন, ফরিয়াদী মাড়োয়ারী হাজির আছেন, আর তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টি-ব্যঞ্জক হাসি হাসিলেন, তখন রাধানাথের কতকটা আশার সঞ্চার হইল; মনে করিলেন, ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

মাড়ওয়ারী, রাধানাথকে দেখিবামাত্রই আপন উকীলকে মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার উপদেশ দিলেন; কিন্তু উকীল মহাশয় নাছোড়্‌বান্দা! তিনি বলিলেন,—"মোকদ্দমা চালাও, এখনি আসামীর ছয়মাস জেল হইয়া যাইবে।" মাড়োয়াড়ীরা, সাধারণতঃ দয়ালু প্রকৃতির লোক; উকীলের কথায় তাঁহার প্রাণে একটু বিঁধিল; তিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিলেন,—"রাধানাথ যদি অনিষ্ট করিয়া থাকে, তবে আমার করিয়াছে, আপনার নহে! আমার নিজের স্বার্থ আমি যতটা বুঝি, আপনার, তদপেক্ষা অধিক বুঝিবার দরকার নাই; আপনি আমার কথামত মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার প্রার্থনা করুন। উকীল বাবু, তখন মুখটি কৃষ্ণবর্ণ করিয়া, মক্কেলের কথামত কার্য্য করিলেন। রাধানাথ খালাস পাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আহুরী, দিন দিন, কলাগাছের মত বাড়িয়া উঠিতেছে, পাড়ার লোকে কাণাঘুষা করিয়া নানা কথা বলিতেছে; এ সকল কথা শুনিয়া রাধানাথের মন আরও আকুলিত হইতেছে; কিন্তু কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এ দিকে সুবিধা মত, তাঁহার অবস্থা মত, বরও যুটিতেছে না; সুতরাং আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে। মনে করিলেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া "বর-কনে" যোটাইবার প্রথা এখন ক্রমে ক্রমে চলিত হইয়া আসিতেছে, অতএব তিনিও তাহা করিয়া দেখিবেন। কথাটা আপন মনে, বারবার ভাবিতে লাগিলেন, দুই একজন বন্ধুবান্ধবকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও এই পরামর্শে সায় দিলেন। রাধানাথ বিজ্ঞাপন লিখিলেন ;—

পাত্রের প্রয়োজন।

কোন্নগরের মিত্রবংশের একটী পরমাসুন্দরী কন্যার জন্য ২৬এর পর্য্যায় একটী পাত্রের আবশ্যক। কন্যাটা লেখা পড়া জানে; চিঠিপত্র লিখিতে পারে, উলের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। পাত্রীর পিতা সম্পন্ন নহেন, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা কম, তাঁহারাই আবেদন করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

২৪ নং গুলুওস্তাগারের লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন লেখা হইল; কিন্তু কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কাজ হইবে,—উদ্দেশ্য সফল হইবে, তখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। লোকে বলে, "বঙ্গবাসী"র গ্রাহক খুব বেশী, অতএব "বঙ্গবাসী"তেই বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হইল। বিজ্ঞাপনটি লইয়া বঙ্গবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন,— "ঐ টেকো বাবুটির নিকট যান।" রাধানাথ বিজ্ঞাপনটি হাতে করিয়া টেকো বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন, বিজ্ঞাপনের কাগজখানি টেকোবাবুর হাতে দিলেন। তিনি বিজ্ঞাপনটি হাতে লইয়া, এক একটি করিয়া অক্ষর গুণিয়া বলিলেন,—"আমাদের একছত্রে একুশটি অক্ষর থাকে, সেই হিসাবে, আপনার বিজ্ঞাপনে দশ লাইন হইবে। প্রতি লাইন ছয় আনা হিসাবে দশ লাইনে তিন টাকা বার আনা দিতে হইবে। কথা শুনিয়া, রাধানাথের, পিলেশুদ্ধ চমকিয়া উঠিল। কাজ হয় কি না হয়, তাহার ঠিক নাই; একদমে পোনের শিকা দিতে হইবে, তাহাও আবার আগাম, ধারে নহে! একবার ম্যানেজার বাবুর হাতে পায় ধরিয়া, কিছু কম করিতে পারেন কিনা সেই চেষ্টা দেখিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। পুনরায় ম্যানেজার বাবুর নিকট গেলেন; কিন্তু ম্যানেজার বাবুর উত্তর শুনিয়া তিনি

আরও অবাক্ হইলেন। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, ও বিষয়ে আমার কোন হাত নাই। বিজ্ঞাপনবাবুর উপর সমস্ত ভার, তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে। রাধানাথ, বিজ্ঞাপন বাবুর বোলচাল, প্রথমে, যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, সুতরাং আর যাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া "হিতবাদী"র ব্যাপারটাও একটিবার দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। হিতবাদী কার্য্যালয়, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী প্রকাশ্য রাস্তার উপর হইলেও, রাধানাথ আর কখনও সেখানে পদার্পণ করেন নাই। বঙ্গবাসী আপীশ হইতে বাহির হইয়া একটুক পশ্চিম মুখ হইয়াই দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত সাইন বোর্ডে লিখিত আছে,—"হিতবাদী কার্য্যালয়"।

সাইনবোর্ড যে দরজায় খাটান ছিল, তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, একটী নাতিদীর্ঘ প্রকোষ্ঠে তিনজন লোক, তিনখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন; সকলের কাছে এক একটী কলম আছে, একজন লোকের চক্ষে একখানি চসমাও আছে। গৃহের চতুর্দ্দিকে, ছাপিবার কাগজ, কেরোসিনের কেনেস্ত্রা, কেরোসিনের ল্যাম্প প্রভৃতি বাজে জিনিশ দেখিয়া, রাধানাথ মনে করিলেন, এটা বোধ হয় গুদাম ঘর। তখন রাধানাথ, চস্‌মাওয়ালা বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "মহাশয়, আপীশটা কোথায়?" বাবুটি উত্তর করিলেন, ইহাই আপীশ, আপনার কি দরকার? 'ইহাই আপীশ,' এই কথা শুনিয়া, রাধানাথ একটু অবাক হইলেন! মনে করিলেন "হিতবাদী" কাগজের এত হৈ চৈ, এত সোর গোল, তাহার আপীশটা এরূপ! আর কিছু না বলিয়া, চারিদিকে চাহিতে আরম্ভ করিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন—চস্‌মাওয়ালা লোকটা কখনও সত্য কথা বলে নাই।

রাধানাথ তখন বিজ্ঞাপনের কথা পাড়িলেন; কিন্তু এখানেও শুনিলেন- সেই বঙ্গবাসীর ধরণের বোলচাল! সেই ছয় আনা হিসাবে লাইন, সেই তিন টাকা বার আনা অগ্রিম দেনা! এখানে রাধানাথ চুপ করিয়া না থাকিয়া, একটী কথা বলিলেন। রাধানাথ যে কথা বলিলেন, সরলভাবে, অনেকেই তেমন কথা বলিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বঙ্গবাসীতে এত লোকজন খাটে; তাহাদের বিশ হাজার কাগজ ছাপাইয়া সদরে মফস্বলে বিলি হয়, তাহাদের খরচা বেশী, কাজেই তাহারা বেশী দাম চাহিতে পারে; আপনাদের আপীশে, দেখিতেছি মাত্র তিনজন লোক, তাহার ভিতর এত খাই কেন? চস্‌মাওয়ালা বাবুটা একটু উষ্ণভাবে বলিলেন, আমাদের কাগজও যে বাইশ হাজার, সদর মফস্বলে বিলি না হয়, ইহা আপনি কিরূপে জানেন?

যাহা হউক, এখানেও রাধানাথের বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা হইল না। তখন তিনি মনে করিলেন, বসুমতী-টাকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া পরে, যাহা হয় করিবেন। ইহা মনে করিয়া, কলুটোলা পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু রাস্তায় যাইতে যাইতে শুনিলেন, বসুমতী আপিস যেখানে ছিল, এখন সেখানে নাই। তখন সত্য সত্যই রাধানাথের মনে একটু ভাবনা হইল; ভাবনা হইল অন্য কিছুর জন্য নহে, তিনি কলিকাতাবাসী হইয়া কলিকাতার খবরের কাগজের খবর রাখেন না, লোকে এই কথাটা শুনিলে কি বলিবে, এই জন্য।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই হয় ত জানেন, আজকাল রাস্তায় রাস্তায় গলিতে ঘুচিতে খবরের কাগজ ফিরি করিয়া বিক্রয় হয়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজার, পাওয়ার-গার্জ্জেন প্রভৃতি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা চুণপুঁটিটী পর্য্যন্ত ফিরি করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইবে,—কোন একখানি কাগজের নাম করিয়া রাস্তায় ডাকিয়া যাইতেছে। এই সকল কাগজওয়ালারা, একে অন্যা-পেক্ষা বেশী বিক্রয় করিবার মানসে, কাগজের তারিখের দুই দিন পূর্ব্বেও কেহ কাগজ বাহির করিয়া

থাকেন। বঙ্গবাসী শনিবারের কাগজ, কিন্তু বৃহস্পতি-বার দিন সকাল বেলা, তুমি বালিশ হইতে মাথা তুলিবার অগ্রেই শুনিতে পাইবে,—"বঙ্গবাসী বাবু বঙ্গবাসী, লড়াইয়ের নূতন খবর, দুই পয়সা দাম।" ট্রামওয়ে আস্তাবলের ধারে, যেখানে ঘোড়া বদলায়, সেখানে শুনিবে,—"বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী ইত্যাদি।" বিক্রেতারা, এক নিশ্বাসে সব কয়-খানির নামও বলিতে পারে না! কিন্তু যেখানে কাগজের এত ছড়াছড়ি, সেখানে বিজ্ঞাপনের দর লইয়া এত কড়াকড়ি, রাধানাথ এই কথাটা বড় ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ধারণা ছিল, জিনিশের বাড়তি হইলেই, সস্তা হয়; কিন্তু যেখানে খবরের কাগজের বংশবৃদ্ধি এত, সেখানে বিজ্ঞাপনের দরের হাঁকডাক এত কেন, এই মোটা কথাটা, রাধানাথ সহজে বুঝিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে পদব্রজে বসুমতীর নাম ধ্যান করিতে করিতে চিৎপুরের রাস্তা ধরিয়া উত্তরবাহিনী হইলেন।

শনিবার অপরাহ্ণ চারিটা; রাধানাথ ধীরে ধীরে বসুমতী ধ্যান করিতে করিতে বরাবর কোম্পানীর বাগানে নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, বসুমতী সভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছে, অতএব ধীরে ধীরে সেই দিকেই চলিলেন।

গ্রে ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আর বড় বেশী চেষ্টা করিতে হইল না; মোড় হইতে খানিকটা পূর্ব্বমুখ হইয়াই বামদিকে দেখিলেন, প্রকাণ্ড সাইন বোর্ডে—বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"বসুমতী কার্য্যালয়।" বাহির হইতে বাড়ীটির কায়দাকানন দেখিয়া মনে করিলেন, এটা সত্যসত্যই একটা আপীসের লায়েক বাড়ী। আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দুই তিনটা মেসিন গড়্‌গড়্‌ করিয়া চলিতেছে, লোকজনও বিস্তর নড়াচড়া করিতেছে। আপীশ কোথায়, কথাটা কহিবামাত্র, একজন বলিল,—"উপরে।" রাধানাথ উপরে উঠিতে লাগিলেন, খানিকটা উঠিয়াই দেখিলেন এবং বুঝিলেন, এটা সত্য সত্যই আপীশ। একটা সুদীর্ঘ হলের ভিতর, তিন চারিটী টেবিল আছে, প্রত্যেক টেবিলের পাশে এক একখানি চেয়ারে এক একটী বাবু বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন, আর একখানি তক্তপোষে আসীন হইয়া একটী ভশ্চার্জি বামুনের ন্যায় লোক, মুদীখানার দোকানের ন্যায় একখানি খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। রাধানাথ, প্রথমে আপীশ ঘরে ঢুকিয়া কাহার কাছে যাইবেন, ঠিক পাইলেন না। তখন, প্রথম স্থানে যিনি বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতেই বিজ্ঞাপনের কাগজখানা দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়,

বসুমতীতে আমার এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিতে হইবে।”

যাঁহার হাতে রাধানাথ কাগজখানি দিলেন, তিনিই ম্যানেজার; বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া, ম্যানেজার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কতদিনের কণ্ট্রাক্ট করিবেন? বিজ্ঞাপনটী, এক বৎসরের কণ্ট্রাক্ট করিয়া ছাপিলে, প্রতি লাইন, প্রতিবারে ছয় পয়সা হিসাবে দিতে হইবে।” কথা শুনিয়া রাধানাথ হাসিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—“মেয়ে বিয়ের পাত্রের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেছি, তাহার জন্য এক বৎসরের চুক্তি করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিব, এ কেমন কথা, মহাশয়? তিনবার কি চারবার প্রকাশ করা যাইতে পারে, ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে। আপনারা চারিবার প্রকাশ করিতে কত মূল্য লইবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই বলুন।” তখন বড় টেবিলের সম্মুখ হইতে বাবুটি বলিলেন,—“আমার নিকটে আসুন, মহাশয়! আমি আপনার কথা শুনি।”

রাধানাথ বিজ্ঞাপনের কাগজটি হাতে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন! এই বাবুটি বেশ অমায়িক লোক বলিয়া বোধ হইল; যাইবামাত্রই বসিতে আসন দিয়া, বেহারাকে তামাক দিবার আদেশ করিলেন; টেবিলের উপর এক-টুক্‌রা কদলীপত্রে, একটি

পান ছিল, পরম সমাদরে, সেই পানটি রাধানাথের হাতে তুলিয়া দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। এখানে রাধানাথ একটু আশ্বস্ত হইলেন। মনে করিলেন, বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক আর না হউক, লোকটার আপ্যায়নও, কতকটা সুখের বিষয় বটে। বাবুটি রাধানাথের হাত হইতে বিজ্ঞাপনটি লইয়া পাঠ করিলেন। দেখিলেন, এ বিজ্ঞাপন চুক্তি করিবার বিজ্ঞাপন নহে; কিন্তু লোকটা যখন, বিজ্ঞাপন দিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তখন, এ কাগজে দিক আর না-ই দিক, কোন একটা কাগজে দিবে, একথা নিশ্চয়। আমি ব্যবসাদার, আমার উপস্থিত অন্নটা ত্যাগ করি কেন, ইহা মনে করিয়া বাবুটি বলিলেন,—"আপনার একটি বই আর মেয়ে নাই কি? যদি তা থাকে, তবে এক বৎসরের চুক্তি করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে, আপনার সুবিধা বই অসুবিধা নাই। বিজ্ঞাপনের জোরে যদি বাকী কয়টির জন্য পাত্র ঠিক হ'য়ে থাকে, তবে শেষ কালে আর, এখনকার মত, আপনাকে বেগ পেতে হবে না।

কথা শুনিয়া রাধানাথের হাসি পাইল! তিনি মনে করিলেন, উপস্থিত যে রোগের জ্বালায় জ্বালাতন হইতেছি, তাহার প্রতিকার হইল না, ভবিষ্যতে রোগ হইবে, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা আগে করিতে হইবে!

ব্যবস্থা মন্দ নয়!! বাবুটীকে বলিলেন,—"মহাশয়, এখন উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপে মুক্তি পাই, তাহার ব্যবস্থা করুণ; আমার এই বিজ্ঞাপনটী চারি সপ্তাহ-কাল প্রকাশ করিতে কত মূল্য দিতে হইবে, তাহা খুলিয়া বলুন; যদি আমার সামর্থ্যে কুলায়, তাহা হইলে প্রকাশ করিব, নতুবা যে রাস্তায় আসিয়াছি, সেই রাস্তায় চলিয়া যাইব।

আপীশের বাবুটী তখন বুঝিলেন, যে চাল চালিয়া লোকটীকে বাগাইতে চাহিয়াছিলেন, সে চাল খাটিল না; তখন বলিলেন,—"মহাশয় যখন, কন্যাদায়গ্রস্ত হিন্দুসন্তান, তখন এ বিষয়ে আমারও যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। যাহা হউক, আপনি প্রতি লাইন প্রতি-বারে এক আনা হিসাবে, চারিবারের জন্য আড়াই টাকা দিলেই, আপনার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিব।" রাধানাথ দেখিলেন, "বঙ্গবাসী" এবং "হিতবাদী" অপেক্ষা "বসুমতী"র অনুগ্রহ একটু বেশী; সুতরাং আড়াইটী টাকা জমা দিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে দিলেন।

একমাস কাল বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইল, কিন্তু রাধা-নাথের দুরদৃষ্টেই হউক, বা বসুমতীর পাঠকগণের দৃষ্টি-হীনতা বশতই হউক, একখানি চিঠিও কেহ লিখিলেন না। রাধানাথ, তখন, মনে মনে কি ভাবিলেন,—সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থাকে কি বলিয়া অভিহিত

করিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি ; তবে, রাধানাথ একদিন বসুমতীর সেই বাবুটীর নিকট যাইয়া নিজের দুঃখ জানাইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার অনর্থক আড়াইটী টাকা খরচ হইল, কিন্তু একখানি চিঠিও পাইলাম না।" বাবুটী তখন বলিলেন,—"মহাশয়, দুই পৃষ্ঠায় ষোল কলম বিজ্ঞাপন আছে, ইহার ভিতর হইতে আপনার দশ লাইন বিজ্ঞাপন, লোকের চক্ষে পড়া অসম্ভব। আপনি যদি ব্লক দিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন, তাহা হইলে, লোকের নজরে বেশ পড়িত !" রাধানাথ, বাবুটীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—"পাত্রীর ফটো তুলিয়া ছবি কাটাইয়া বিজ্ঞাপন দিতে পরামর্শ দিতেছেন দেখিতেছি ! তাহাও কি কখনও হয় ! !" খবরের কাগজের আপীশের বাবু ; কথাবার্ত্তায়, তাঁহারা, কখনও হটিবার লোক কি ? বাবুটীও অমনি উত্তর করিলেন,—"যখন সুন্দরী কন্যা বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে দোষ বোধ হয় না, তখন ফটো দিয়া বিজ্ঞাপন দিলে আর অপরাধটা কি ? বরং গ্রাহক বেশী জুটিবার সম্ভাবনা।"

বাবুটীর কথা শুনিয়া, রাধানাথ সত্যসত্যই অপ্রতিভ হইলেন। অপ্রতিভ হইবার কথাও ত বটে ! সুন্দরী-দিগের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া বর যুটাইবার প্রথা, এতদিন ফ্রান্সের প্যারিস সহরেই ছিল ; এখন তাহা

ক্রমে ক্রমে ভারতের হিন্দুর ঘরেও প্রবেশ করিয়াছে। রাধানাথ, দশের দেখাদেখি, তাহা করিতে যাইয়া, লাভের মধ্যে, আড়াই টাকা আক্কেল সেলামী দিলেন মাত্র। বাবুর কথা শুনিয়া, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, ধীরে ধীরে উল্টা রাস্তা দেখিলেন। বিজ্ঞাপন দিয়া বর যুটাইবার আশা এই খানেই মিটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিজ্ঞাপনের আশায় হতাশ হইয়া রাধানাথ ঘরে আসিলেন। রাধানাথের গিন্নি, পান খাইয়া ঠোঁট দুটী লাল টুক্‌টুকে করিয়া, আলবাট ফ্যাসানে চুল আঁচড়াইয়া, কোলের মেয়ে নিয়ে ন্যাক্‌রা-ঝ্যাক্‌রা করিতেছেন, এতক্ষণ যেন মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছিল; কিন্তু রাধানাথকে দেখিবামাত্র, সেই হাসি মুখে যেন, ছাইয়ের চোপ্ পড়িল! পূর্ণিমার চাঁদখানি যেন মেঘে ঢাকা পড়িল! যোড়া গালে যেন, দুটী মাল্‌সা আসিয়া বসিল!! রাধানাথ গিন্নির মুখখানি দেখিয়াই মনে মনে ভাবিলেন,—গতিক ভাল নয়, আজও হয়ত, পোড়া অদৃষ্টে দুটী ভাত জুটিবে না!

রাধানাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া জামা চাদর রাখিলেন, কল্কেটী লইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন, মেঝ কন্যা-টীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, একখানি টীকে ধরিয়ে আন্।" রাধানাথের গিন্নি,টীকে ধরাইবার কথা শুনিয়াই বলিলেন,—"টিকে কোথায়, যে ধরাইবে? টিকে নাই, দেশলাই নাই—তামাক'ও বুঝি ডু-এক কল্কের বেশী নাই।" বলা বাহুল্য, গিন্নি এই কয়টি কথা, যে ভাবে বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রাধানাথের মনে হইল, এ বাড়ী ঢোকা অপেক্ষা, নিমতলায় ঢোকা শতগুণে ভাল। কিন্তু কি করেন; সে কাজটা ত আর আপন ইচ্ছায় হয় না! তবে যদি বল, গলায় দড়ি দিলে চলে; কিন্তু সেটাও বড় সোজা কথা নয়। তার, দড়ি চাই, সেই দড়ি খাটাইবার জন্য কায়দা মত স্থান চাই, এসকল যোগাড় যন্ত্রের পর, সাহসটি চাই। রাধা-নাথের, ইহার কোনটিই ছিল না; সুতরাং গৃহিণীর হাতনাড়া, মুখঝাড়া সহ্য করিয়া জুজুটির মত হইয়াই থাকিতে হইত। আজিও রাধানাথ সেই অবস্থাতেই রহিলেন। রাবানাথের গৃহিণী দেখিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া রাধানাথ আর বাক্যব্যয় করিলেন না; তখন আবার ভ্রূকুঞ্চিৎ করিয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলি-লেন,—"বড় চুপ করিয়া রহিলে যে? ব্যাপারখানা কি, বল দেখি? মেয়ের বিয়ে বিয়ে ক'রে ত, আমার

জ্যাকেট্‌টি দিবার অবসর পেলে না! এখন সে মেয়ের বিয়েই বা কোথায়, বরই বা কোথায়; আমি ত কোন যোগাড় যন্ত্রই দেখিতে পাইতেছি না! পাড়ার লোকে কত কথা বলিতেছে, শুনিয়া কাণ ঝালপালা হইতেছে। যদি আর কোথাও যোগাড় না হয়, তা হ'লে, ঘরে ঘরেই কাজটা সারিয়া, মান কাণ রক্ষা কর না কেন?"

গিন্নির কথা শুনিয়া, রাধানাথ আরও একটু আতঙ্কিত হইলেন। এতদিন গত হইল, রাধানাথ, গিন্নির মুখ হইতে একটি দিনও, মেয়ের বিবাহের জন্য, ভাবনা চিন্তার কথা শুনিতে পান নাই। আজ, হঠাৎ, তাঁহার মুখ হইতে এহেন কথা শুনিয়া, রাধানাথ একটু বেশী ব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে নিজের মনের ব্যস্ততা গোপন করিয়া, গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ঘরে ঘরে কাজটা কিরূপে সারিয়া লইতে চাও, বল দেখি?

গিন্নি তখন, ঘোমটার মাত্রাটা একটু কমাইয়া, মাথাটিকে তিনটা নাড়া দিয়া বলিলেন,— কেন? ঘরে অভয় আছে, তাহার সঙ্গে আদুরীর বিয়ে দাও না কেন? সেও ত কায়েতের ছেলে; দেখ্‌তে শুন্‌তে দিব্বি কাত্তিকটীর মত চেহারা; তারাও ত ঘোসবংশ, কুলীন, তবে আর তাতে তোমার আপত্তিটাই বা

কি ? সেদিন মুখুয্যেদের বাড়ীর বিনোদ বল্লে, আদুরীরও ইচ্ছা আছে, তার সঙ্গে অভয়ের বিয়ে হয় ; আদুরী নাকি বিনোদকে একথা একদিন বল্লেছেও। আমি বলি, তাই কর ; নগদ টাকা দিতে হবে না, গহনাগাটীও, যা পার, তাই দেবে, না পার, তাতেও কেহ কিছু বল্‌তে পারবে না। তা আমিও এটা ভালই বুঝি। আমারও ছেলে নাই ; যদি আদুরীর সহিত অভয়ের বিয়ে হয়, তাহা হইলে সে-ই ছেলের মত হ'য়ে বাড়ীতে থেকে, যা উপার্জ্জন কর্‌বে, আমারই ঘরে আসবে, আদুরীও কাছ ছাড়া হবে না। আমি ত এরূপই বুঝি ; তবে তোমার বুঝার সহিত, আমার বুঝাবুঝি, প্রায়ই মিলে না ; যদি তাহাই হইত, তবে কি আর ছয় মাস যাবৎ একটি জ্যাকেটের জন্য আমি ভিকারীর মত, রোজ রোজ তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতাম ? তা, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে, আরও যদি কিছু থাকে, তাহাও ঘটবে। আমি বলি, তুমি আর কোন দিকে না চাহিয়া, আর কাহারও কোন কথা না শুনিয়া, আমার কথাটাই রাখ ; এই মাসের মধ্যেই, অভয়ের সঙ্গে আদুরীর বিবাহ দিয়ে ফেল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, রাধানাথ, অনেক দিন থেকেই একথা মনে করিয়াছিলেন ; এবং সেজন্যই,

অভয়কে হাতের পাঁচ রাখিয়া, এদিক ওদিক চেষ্টা করেন। রাধানাথের মনে মনে যাহা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। একে দরিদ্র, তাহাতে ঘরের গিন্নিটী যেন, টেক্সদারোগা। দাম্পত্য টেক্সের পীড়নে রাধানাথ, চব্বিশ ঘণ্টা নিপীড়িত। রাধানাথ, এই টেক্সের দায় হইতে— যে কোনদিন নিষ্কৃতি পাইবেন, সে আশা খুব কম। সুতরাং গিন্নির কথা শুনিয়া, রাধানাথ, নেহাৎ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনের কথা খুলিয়াই বলিলেন। বলিলেন,—অভয়ের সঙ্গে আদুরীর বিবাহ দেওয়া, আমার ইচ্ছা থাকিলে, এতদিন তাহা করিতাম; কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে, তাহা করিতে হইবে বলিয়াই অনুমান হইতেছে। আমার মনে মনে, একথা, অনেকদিন থেকেই জাগে, কিন্তু তোমার ঐ শ্রীমুখের ভ্রূকুটীর ভয়ে, এতদিন তাহা বলি নাই।

রাধানাথের গিন্নি, কি প্রকৃতির লোক, এতদিনে পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। রাধানাথের কথা শুনিয়া গিন্নি বলিলেন,—অভয় ছেলেটা মন্দই বা কি? দেখ্‌তে শুন্‌তেও বেশ, জাতকাঠও ভাল; তবে, লেখাপড়া তেমন জানে না। তা, সকলেই কি লিখে প'ড়ে পণ্ডিত হ'তে পারে? কায়েতের ঘরের ছেলে, বুদ্ধি ক'রে চল্‌তে পাল্লে, একটা না একটা

মতলব ক'রে, দু'পয়সা আনতে পারবেই। এই দেখনা কেন, আমার ছোট পিসিমার মেঝ ছেলে হাবু. লেখা-পড়া আদবে শিখে নাই; এমন কি নামটা লিখতেও তাহাকে গলদ্ঘর্ম্ম হ'তে হ'ত। পিসে মহাশয় ভবানী-পুরের নন্দনদের কারখানায়, হেবোকে মিস্ত্রীর কাজ শিখতে দেন; ৩।৪ মাস পরে সেখানে তার দশটাকা মাইনে হয়, এখন সে নিজে কিসের দোকান করে বসেছে, তাতে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন কচ্ছে। এখন সে, থানের কাপড় পরে, ইস্ত্রী করা জামা গায় দেয়, চেয়ারে বসে, গড়গড়ায় তামাক খায়, টানা-পাখার হাওয়া খায়, ঘড়ীর চেন্ ঝুলিয়ে, রাস্তায় বের হয়; এখন তাকে লোকে হাবু বাবু বলে ডাকে। তেমন ভাল ঘরে তার বিয়ে হয়েছে। যদি আদুরীর বরাত ভাল থাকে, তবে অভয় হতেই তার সুখ হবে, আর যদি অদেষ্ট খারাপ হয়, তবে, তুমি বিদ্যাদিগ্গজ পণ্ডিত দেখে দিলেও কিছু হবে না।

গিন্নির কথাগুলি শুনিয়া, রাধানাথ সব কথাতেই ঘাড় নাড়িলেন; দুই একটা কথা তাঁহার মনের মতনও হইল; কিন্তু খোলসা করিয়া কোন কথাই বলিলেন না। গিন্নির কথায় সায় দিয়া সেদিনকার মত কাজের খতম করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের সঙ্গে, অনেক ক্ষণ, অভয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। আপনারা হয় ত, মনে করিয়াছেন, অভয় সেই কোকেনের মৌতাতে পড়িয়া, কোকেনই খাইতেছে, আর গরাণহাটার মোড়ে আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে। ফলে কিন্তু তাহা নহে। গরাণহাটার মোড়, জায়গাটী মন্দ নয়। এখানে যেমন, নানাপ্রকার আড্ডার স্থান আছে, ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষেও সুবিধা আছে; মোড়ের খানিকটা উত্তরে সরিয়া দাঁড়াইলেই, বটতলার অনেক সরস্বতীর বরপুত্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়। এখানে সরস্বতী, স্বহস্তে ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, বরপুত্রেরা এই ছাঁচে ঢালিয়া অনেক নিষ্কর্ম্মা বখাটে ছেলেকে, গ্রন্থকার করিতেছেন। অভয়, এখানে কিছুকাল, যাতায়াত করিয়া, গ্রন্থকার হইবার মতলব করিলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় যতটা দখল আছে, তাহাতে গ্রন্থকার হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে; সুতরাং কি উপায়ে গ্রন্থ-কার সাজিবেন, ইহাই তখন তাহার একমাত্র চিন্তার কারণ হইল।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বটতলার খবর রাখেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, অভয় কি উপায়ে গ্রন্থকার সাজিবার চেষ্টায় আছে। স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কৃপায়, দেশের "স্ত্রীপুরুষ" উপন্যাস পাঠে, কিছুকাল, ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। বটতলার সরস্বতীর কৃপায় এখন, তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। অনেক রামু শামুর কৃপায়, উপন্যাসাতঙ্ক রোগটা, এখন, অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ফলে, দিনকতক, বটতলার সরস্বতীর উপন্যাসপ্রসবিণী শক্তি এতটা প্রখরা হইয়াছিল যে, বছরে তিন শত পাঁয়ষট্টিখানা অপেক্ষাও অধিক উপন্যাস জন্মাইত। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কৃপায়, এই সকল উপন্যাস দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া, নবীন নবীনাদিগকে যে, কি ছাঁচের ছবি করিয়া তুলিয়াছে, ঘরে ঘরে, এখন তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন।

অভয়, গ্রন্থকার হইবার আশায়, সর্ব্বপ্রথমে, এক বইয়ের দোকানের সরকার হইল। বই বেচা, বইয়ের ফর্ম্মা ছাপা হইলে তাহা ভাজা, ডাকঘরে বইয়ের প্যাকেট দেওয়া, তামাক সাজা, দোকান ঘরে ধূনা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে অভয়ের একাধিপত্য ছিল। অভয় সারাদিন এই সকল কার্য্য করিত, আর দোকানের মালীক, কি উপায়ে বই সংগ্রহ করেন, তাহার

সন্ধান করিত। কয়েকদিন সন্ধান করিয়াই দেখিতে পাইল, তাহার মনীব, অন্যের নিকট হইতে পাণ্ডুলিপি ক্রয় করিয়া অন্যের ছাপাখানা হইতে বই ছাপিয়া লয়েন। অভয়েরও সেই ইচ্ছা বলবতী হইল; অভয়ও পাণ্ডুলিপির সন্ধানে রহিলেন।

একদিন সকালবেলা, অভয়, দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময় একটি চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, একতাড়া কাগজ হাতে করিয়া অভয়ের মনীবের সন্ধান করিতে আসিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আগন্তুকযুবক বলিলেন,—"ফুলকুমারী"নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছি, তিনি তাহা ক্রয় করিবেন বলিয়া কথা আছে, আমি তাহাই লইয়া আসিয়াছি। অভয় হস্তলিপিখানি হাতে লইয়া দেখিলেন, বইখানা অন্যূন একশত কুড়ি পৃষ্ঠা হইবে। যুবকের নিকট হইতে পাঁচটাকা মূল্যে পাণ্ডুলিপি ক্রয় করিলেন; বলাবাহুল্য, মনীব তাহা জানিলেন না!

পাণ্ডুলিপি ক্রয় হইল বটে, কিন্তু কি উপায়ে পুস্তক ছাপাইয়া গ্রন্থকার হইবেন, তখন তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। কিন্তু এ চিন্তায় তাহাকে অনেক ক্ষণ চিন্তিত থাকিতে হইল না। অভয়, যে দোকানে চাকরী করিত, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য দোকানদারের সহিত বই ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিল। বই বিক্রয়

হইলে খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে, উভয়ে তাহা তুল্যাংশে গ্রহণ করিবে, এ বন্দোবস্তই ঠিক হইল; পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইল, পুস্তকের নাম হইল "ফুলকুমারী।"

এ স্থলে পুস্তক ছাপার ব্যবস্থাটাও পাঠকগণকে একটু জানান ভাল। বোধ হয়, পাঠক মাত্রেই জানেন, বটতলার ছাপা পুস্তকে, যদি মূল্য লেখা থাকে দুই টাকা, তবে তাহা চারি আনাতেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। পুস্তকের আয়তন দেখিয়া, উহার লিখিত মূল্য অন্যায় বলিয়া মনে করিবার যো নাই। অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকের আয়তন ও মূল্যের সহিত তুলনা করিলেও, বটতলার প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য সুলভ বলিয়াই বোধ হইবে; কিন্তু বটতলাওয়ালারা এত সুলভে কি উপায়ে বই বিক্রয় করিতে পারে, তাহা জানিবার জন্য হয়ত, সকলেই সমুৎসুক। যাঁহারা বটতলার ছাপা বই পড়িয়াছেন, তাঁহারা হয়ত অনেক স্থানেই দেখিয়াছেন, 'ল' র স্থানে 'ব' 'খ' র স্থানে 'ক' ছাপা হইয়া থাকে; এরূপ কেন, জানেন কি? অন্যান্য স্থানের ছাপাখানায়, কোন অক্ষরের অভাব পড়িলে, তাহা আনিয়া কার্য্য চালান হয়; বটতলাওয়ালারা ততটা ক্ষতি স্বীকার করিতে চায়না। তাহাদের ছাপাখানায় কোন অক্ষরের অভাব হইলে, যে অক্ষরটা বেশী থাকে, তাহা দিয়াই অভাব পূরণ করিয়া লয়;

কাজেই একটার স্থলে অপরটা দেখিতে পাওয়া যায়। এ ত গেল অক্ষর যোজনার বন্দোবস্ত। অক্ষর যোজনা হইলে, ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা, বটতলাওয়ালারা সর্ব্বদাই পরিহার করে; কারণ বর্ণ যোজনার পর, আবার ভুল দেখিয়া সংশোধন করিতে হইলে, শুধু সময়ের আবশ্যক হয় না, প্রুফ সংশোধন করিবার উপযোগী একজন লোকেরও আবশ্যক হয়; অতএব এতটা করিতে গেলে পয়সা খরচও একটু বেশী হয়। কাজেই ইহারা এই বাবদে পয়সা খরচাটাও বাঁচাইয়া থাকেন। বইয়ের কাগজ সম্বন্ধে ইহাদের ব্যবস্থা বড়ই চমৎকার। রামায়ণ, মহাভারত, শিশুবোধ প্রভৃতি পুস্তকে যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, সে কাগজ, আপনি শত চেষ্টা করিলেও পাইবেন না! এ কাগজ যেন, ইহারা ঘরে জন্মাইয়া লয়। কিন্তু সাধের উপন্যাস, যখন বটতলার প্রবেশ করে, তখন কাগজটার একটু উন্নতি হইয়াছে। এ কাগজে পালিশের নাম গন্ধ না থাকিলেও, দেখিতে বেশ পুরু; বই খানি ছাপা হইলে, হাতে লইলে বোধ হয়, মূল্যের উপযোগী জিনিশই বটে; কিন্তু খুলিয়া দেখিলেই মনে হয়, ডুমুর পাতায় আর এই কাগজে কোন তফাৎ নাই!

তার পর ছাপা। বটতলার ছাপাখানায়, এক-টাকা মজুরীতে তিন হাজার কাগজ ছাপিতে পারা

যায়; অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, ছাপিবার সময় বিনা কালীতেও ছাপিয়া থাকে। ছাপাখানাওয়ালার, তাহাতে কিছু বলিবার যো নাই; কারণ, প্রেসম্যানের সঙ্গে তাহার কাজের ফুরণ রহিয়াছে। এইরূপে বই ছাপা হইয়া গেলে, কাগজ ভাঁজা কাজটা, দোকানদার ভায়ারা নিজ হাতেই সারিয়া লন। শেলাই করা কাজগুলিও স্বহস্তেই সমাধা হইয়া থাকে, তবে চারিদিক কাটিয়া সমান করিয়া লইবার সময় দপ্তরীর দ্বারে যাইতে হয় এবং কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়। অতএব পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন, বটতলার বই সুলভ কেন।

অভয়ের "ফুলকুমারী" উপন্যাস, এই ভাবেই ছাপা হইল; মেসো পুরু কাগজে ১২০ পৃষ্ঠার বই হইল, দেখিতে বেশ বেশ মোটা সোটা হইল, বইয়ের মূল্য ধার্য্য হইল এক টাকা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দিয়া বই বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা, বটতলাওয়ালারাও ধরিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদপত্র খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, বটতলার বিদ্যাবাগীশেরা রঙ বেরঙের বোল চালে বইয়ের বিজ্ঞাপন দিতেছে। এক টাকা মূল্যের বইয়ের সঙ্গে তিন টাকা মূল্যের বই ফাউ দিয়া গ্রাহকদিগের কুটিরে "লাইব্রেরী"

সাজাইবার পরামর্শ দিতেছে। আজি কালি, অনেক পুস্তক ব্যবসায়ী এরূপ উদারতা, বিজ্ঞাপন করিয়া, নিরীহ মফস্বল বাসীগণের পরম সুবিধা করিতেছেন। ফলে, অভয়ের "কুলকুমারী" উপন্যাসের বিজ্ঞাপনও তেমন ভাবেই প্রকাশ হইল।

বিজ্ঞাপন বাহির হইল, বই বিক্রয়ও আরম্ভ হইল, অভয়ের মনেও একটু একটু ফূর্ত্তির ভাব দেখা দিল। অভয় তখন মনে করিল, আর আমাকে পায়কে! বইয়ের মলাটে নাম হইয়াছে, শ্রীঅভয় কুমার বসু; এখন আর ভাবনা কি? লোকে নাম দেখিয়া মনে করিবে, বই খানা আমারই লেখা! এরূপ দুই চারিখানি বইয়ে নাম ছাপা হইলেই গ্রন্থকার বলিয়া লোকে আমার সম্মান করিবে। ফলে, অভয় তখন চেষ্টা চরিত্র করিয়া আরও এরূপ দুই তিন খানি বইয়ের জোগাড় করিল। ভগবানের কৃপায় বই বিক্রয় করিয়া অভয়ের, সামান্য কিছু সংস্থানও হইল, সুতরাং চাল চলনটাও একটু বদল হইল।

মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় অন্তরঙ্গের দেখা সাক্ষাতের বেশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। তোমার অবস্থা যখন খারাপ হইবে, যখন তুমি দিনান্তে একবেলা আহারের সংস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, তখন তোমার আত্মীয় স্বজন, দশহাত তফাতে যাইয়া

দাঁড়াইবে। তখন তোমার খুড়া, জ্যেঠা, মামা প্রভৃতি যে যেখানে থাকে, সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে,—এ আমাদের কেহ নয়। কিন্তু যখন তুমি দু'বেলা দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইবে, তখন, আপনার লোকগুলি ত চতুর্দ্দিকে আসিয়া ঘিরিয়া বসিবেই, বাজে লোক, দুই চারিজন আসিয়াও বলিবে, আমরা তোমার মামা। একটু লক্ষ্মীর দৃষ্টি হইলে যে, এরূপ মামা অনেক যোটে, সংসারে একথা অনেকেরই জানা আছে। আজ অভয়েরও এরূপ দুই একটি মামা আসিয়া যুটিল। মামারা আজ অভয়ের মুখখানির দিকে চাহিয়া, কেহ বলিতেছেন,—খাটিতে খাটিতে অভয়ের চেহারা ভারি বদ হইয়া গিয়াছে; কেহ বলিতেছেন এত খাটুনিতে একটু একটু ঘি মাখন না খাইলে শরীরটা টিকিবে কেন; আর একজন বলিতেছেন,—তাই ত, কচি ছেলে, তার এত খাটুনি! খাওয়া দাওয়াটা একটু ভাল না হইলে দেহটা কিরূপে রক্ষা পাইবে। ইত্যাকার নানা প্রকার মিষ্ট বচনে তখন ভূইফোঁড় মাতুল মহাশয়েরা, অভয়কে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ইহাদের এরূপ আদর আপ্যায়ন দেখিয়া, অভয় তখন ইহাদিগকে সত্য সত্যই মামা বলিয়াই মানিয়া লইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

রাধানাথ এবং তাঁহার গিন্নি, বেশ টের পাইয়াছেন যে, অভয়, বটতলায় বইয়ের কারবার করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে; অভয়ের চাল চলনও একটুক উঁচু উঁচু হইয়াছে। বিলিতি জুতা, ঢাকাই ধুতী, পি, সি, পাল কোম্পানীর বাড়ীর হাই কলারের সার্ট, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন প্রভৃতি, এখন অভয়ের পরিচ্ছদের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে সম্ভব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। রাধানাথ এবং তাঁহার গিন্নির প্রতি অভয়ের যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, এখন তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাধানাথের সন্তানগুলির প্রতি অভয়ের একটু যত্ন হইয়াছে। আজ কাপড় খানা, কাল জামাটা, এরূপ ভাবে যখন যেটি দরকার পড়ে, আর অভয় জানিতে পারে, তাহাই আনিয়া দিয়া অভাব পূরণ করে। আদুরীর সম্বন্ধে কিন্তু, রাধানাথের ভাব অন্যরূপ! আদুরী চৌদ্দবছরের আইবুড় মেয়ে; তাহার এ বয়সে কি কি দরকার, অভয় তাহা বেশ বুঝিতে পারে; আদুরীর দরকার মিটাইতে, অভয়ের ইচ্ছাও হয়; কিন্তু কি জানি কেন, সে তাহা করিতে পারে না! এতদিন আদুরীর সঙ্গে সরলভাবে কথা

কহিত, আদুরীর সঙ্গে আদরের ঝগড়া করিত! আদু-রীর হাত হইতে খাবার কাড়িয়া খাইত। কিন্তু আজ অভয় তাহা পারিতেছে না! আদুরীর জন্য, এন্ গুপ্তের সুকুন্তলা তৈল, খোপার জন্য 'মনে রেখো' মটোওয়ালা চিরুণী, খোপায় জড়াইবার জন্য নানা রঙের ফিতা, আদুরীকে দিতে ইচ্ছা হইতেছে। অভয়, এ সমস্ত জিনিশই কিনিয়া কাটিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে; নিজের বিছানায় বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু দিতে ইচ্ছা করিতেছে, দিতে পারি-তেছে না। একবার মনে করিতেছে, আদুরীকে ডাকিয়া আদর করিয়া এখনি দিবে; কিন্তু কে যেন তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছে। অভয়, দিতে পরি-তেছে না বলিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে মনের কষ্ট মনেই থাকিতেছে, খুলিয়া বলিবার লোক কেহ ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বলিতে পারিতেছে না।

পাঠক জানেন, মুখুয্যেদের বাটীর মেয়ে বিনোদের সহিত আদুরীর খুব মাখামাখি ভাব। বিনোদ জানে, আদুরী অভয়কে ভালবাসে, অভয় তাহার স্বামী হয়, এটা তার ইচ্ছা। আদুরীর মা, একদিন বিনোদকে দিয়া, আদুরীর মনের কথা বাহির করিয়া জানিয়াছিলেন, আদুরী অভয়কে ভালবাসে, অভয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হইলে সে সুখী হইবে। শুধু ইহা নহে; অভয় যখন

বাড়ী আসে, তখন তাহার জন্য, ভেলের বাটীতে তেল ঢালিয়া, গামছা খানা ভাঁজ করিয়া, অভয়ের শোবার ঘরে আদুরী রাখিয়া দেয়; পান সাজিয়া ডিবায় করিয়া বিছানায় বালিশের পাশে রাখে। অভয়কে তাহার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাই কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া, অভয় যতক্ষণ বাড়ী থাকে, ততক্ষণ তাহাকে আড়-চোকের চাহনীতে দেখে; কিন্তু অভয়কে দেখিয়া যেন, আদুরীর সাধ মিটে না! যতই দেখে, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অভয় যখন বাড়ী হইতে বাহির হয়, আদুরী কপাটের আড়াল হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। আদুরী অভয়ের প্রতি যেরূপ আনুরক্তি-আশক্তি দেখায়, আদুরীর মা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, আর মনে মনে সুখী হইয়াছেন। খুলিয়া বলিবার সুবিধা পান নাই, কাহাকে খুলিয়া বলেনও নাই।

আদুরীর মনের ভাব, রাধানাথও কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। বলিতেন না, লোকলজ্জার ভয়ে। এতবড় আইবুড় কন্যা ঘরে রহিয়াছে, তাহাতে আর একটী বেগানা যুবক বাড়ীতে, তাহার উপর আবার আদুরীর টান; পাঁচজনে পাঁচকথা বলিলে বলিতেও পারে। এই সকল পাঁচটা ভাবিয়াই রাধানাথ কোন কথা মুখের বাহির করিতেন না। কিন্তু

যখন দেখিলেন, গিন্নীও ইহাতে রাজী আছেন, তখন আর তাঁহার কোন কথায় আপত্তি রহিল না; অভয়ের সঙ্গেই আদুরীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, গিন্নী কথায় সায় দিলেন; অভয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যাহাদের পয়সার অভাবটা কিছু বেশী, লোকে তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা, মুখের বাহির করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আদুরীর সহিত অভয়ের বিবাহের কথা প্রকাশ হইবার পর, সত্য সত্যই, পাড়ায় নানা কথার অবতারণা আরম্ভ হইল; কিন্তু রাধানাথ কোন কথায় কাণ দিলেন না। তিনি পুরোহিত ডাকাইয়া দিন স্থির করিবার মনস্থ করিলেন। গিন্নি বলিলেন, দিন স্থির করিবার পূর্ব্বে, একথাটা, অভয়কে একবার জানান দরকার। কি জানি, ইহাতে তাহার যদি কোন আপত্তি থাকে, তবে ত আর একাজ হওয়া সম্ভব নয়। গিন্নির কথায় রাধানাথের চৈতন্য হইল; তিনিও বুঝিলেন, অভয়ের মত না লইয়া কোন কথা পাকাপাকি করা ঠিক কথা নহে।

বেলা দশটা বাজিয়াছে, রাধানাথ এবং রাধানাথের গিন্নী, বারান্দায় বসিয়া এ সকল কথাবার্ত্তা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, অভয় আসিয়া সদরের কপাটের কড়ানাড়া দিয়াছে। আজ

গিন্নীঠাকুরাণী স্বয়ং কপাট খুলিতে গেলেন। এতক্ষণ যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আদুরী ঘরের ভিতর কপাটের আড়ালে বসিয়া তাহা শুনিতেছিল, আর আপন মনে ভাবিতেছিল ;—হয় ত অভয় রাজী হইবে না! আবার ভাবিতেছিল,—না, অভয় আমায় ভালবাসে। আমি তাহাকে ভালবাসি, সেও তাহা জানে ; সে নারাজ হইবে না।

কপাট খোলা হইলে অভয় দেখিল, আজ খোদ গিন্নি ঠাকরুণ দরজা খুলিয়া দিয়াছেন,—আর তাহাকে দেখিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন ; এ হাসি সরলতাপূর্ণ স্নেহমাখা। গিন্নীর হাসি দেখিয়া অভয়ও একটু হাসিল ; এ হাসিটীকে যেন, লজ্জায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অভয়, বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই, স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল আর বাহির হইল না। তাহার হাতে, কাগজে মোড়া একটী কি ছিল, বিছানায় বালিশ চাপা দিয়া তাহা রাখিয়া দিল, আদুরী কপাটের আড়াল হইতে তাহা দেখিতে পাইল। গিন্নী ঠাকুরাণীও ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু ভিতরে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার ততটা আগ্রহ জন্মে নাই। অভয় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছে, কপালময় গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, চুলগুলি মাঝামাঝি করিয়া ফিরানো। রাধানাথের গিন্নী মনে করিলেন,

অভয় যেন তখনি বরটী সাজিয়া আসিয়াছে। ফলে অভয়ের চেহারা দেখিয়া, অনেকেই তাহাকে জামাই-রূপে পাইতে ইচ্ছা করিবেন, ইহা অন্যায় কথা নহে। অভয় সত্যসত্যই, কায়েতের ঘরের সুন্দর ছেলে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ অভয়, আদর আপ্যায়ন একটু বেশী পাইলেন। আজ রাধানাথের গিন্নি, এক খানি সুন্দর আসন পাতিয়া, বড় থালায় করিয়া অভয়কে ভাত দিয়াছেন। অভয় আহার করিতে বসিলে, তিনি তাহার কাছে ঘেসিয়া বসিয়া, 'পেটভরে খাও বাবা' বলে ভালবাসা দেখাইতেছেন; এক কথায়, এরূপ স্থলে এরূপ অবস্থায়, স্ত্রীলোকেরা আদর অপ্যায়নে যেরূপ অভ্যস্ত, রাধানাথের গিন্নি, সেই মেয়েলী আইন অনুসারে সবই করিতেছেন। অভয় কিন্তু গিন্নির এ ব্যবহার দেখিয়া কিছু ঠাওরাইতে পারিতেছে না। দু'দিন, চারি দিন নয়, প্রায় এক বছর হইতে চলিল, অভয় রাধানাথের আশ্রয়ে আছেন, কিন্তু এরূপ ভালবাসা আর কখনও পান নাই। অভয়ের মাতৃ বিয়োগের পর, "পেট ভরে খাও বাবা" বলে

তাহাকে কেহ, একটী দিনও বলিয়াছে, ইহা তাহার মনে পড়ে না। আজ হঠাৎ রাধানাথের গিন্নির এই স্নেহটুকু দেখিয়া, অভয়ের জননীর কথা মনে পড়িল: মুখখানি রক্তিম হইল, চক্ষুদুটী ছল ছল করিতে লাগিল, টল টল করিয়া দুইবিন্দু চক্ষের জল ভাতের উপর পড়িল! রাধানাথের গিন্নি তাহা দেখিতে পাইয়া সস্নেহে বলিলেন,—বাছা! অভয়, প্রায় এক বৎসর হইল, তুমি আমাদের সহিত একত্র বাস করিতেছ, কোন দিন তোমার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিতে পাই নাই; আজ হঠাৎ তোমার এরূপ পরিবর্তন দেখিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

গিন্নির কথা শুনিয়া অভয়ের মনে, জননীর শোক আরও বাড়িয়া উঠিল; কিছুকাল কোন উত্তর না দিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেক কষ্টে মনের কষ্ট সম্বরণ করিয়া কহিলেন, আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া মাতৃশোক ভুলিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার আজিকার সস্নেহ বাক্য শুনিয়া আমার, সেই স্নেহময়ী জননীর কথা মনে পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া আমার আর কোনরূপ কষ্ট নাই।

গিন্নি অভয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন,—বাছা অভয়, পিতামাতা লইয়া কেহ চিরকাল বাস করে না। মানুষের মৃত্যু আছেই। তুমি তোমার মা-বাপের একমাত্র

সন্তান ছিলে; তোমাকে বর্ত্তমান রাখিয়া যে তাঁহারা স্বর্গ-বাসী হইতে পারিলেন ইহা তাঁহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা ; অতএব এজন্য তোমার দুঃখ করা সঙ্গত নহে। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার অনুশোচনায় কোন ফল নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকেই তোমার মাতৃস্থানীয়া বলিয়া মনে করিতে পার ; আমিই তোমার জননীর অভাব পূরণ করিব। তা ছাড়া, আমি তোমাকে আরও একটী কথা বলিব বলিয়া অনেকদিন হইতেই মনে করিয়াছি ; কিন্তু সুবিধা পাই নাই বলিয়া, এতদিন বলি নাই ; যদি তুমি আমার কথা রাখ, তাহা হইলে, তাহা বলিতে পারি।

গিন্নির কথা শুনিয়া অভয়ের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। আজ গিন্নি ঠাকুরুণ যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, এখানে অবস্থিতির সময় আর কখনও এরূপ কথাবার্ত্তা হয় নাই। অভয়ের মনে একটু আনন্দের উদ্রেক হইলে, জননীর শোক আর তখন, মনে রহিল না। তখন আর একটী নূতন ভাব আসিয়া তাহার মনটীকে অধিকার করিয়া বসিল। অভয়ের বুক ধরফর করিয়া উঠিল। এদিকে রাধানাথ যেমন আদুরীর বিবাহ দিবার জন্য নিয়ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, আহার নিদ্রা একরূপ ত্যাগ হইয়াছিল, আদুরীকে

বিবাহ করিবার জন্য অভয়ের মনেও প্রায় তদ্রূপ উদ্বিগ্নতা সর্ব্বদা বিদ্যমান! গিন্নীর কথা শুনিয়া অভয়ের মনে হইল, আদুরীর বিবাহের কথা বোধ হয়, তাহাকে বলা হইবে। এ সকল ভাবিয়া, অভয় আর মুখে গ্রাস তুলিবার সুবিধা পাইল না, ভাতের থালায় হাত দিয়া কিছুকাল মাথা হেট করিয়া রহিল।

গিন্নী, রাধানাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,— বাছা অভয়! এমনটী করিয়া রহিলে কেন? আমি তোমাকে যাহা বলিব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। তুমি প্রায় বৎসরেক যাবৎ আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ; তোমার প্রতি আমাদের সন্তানের স্নেহ জন্মিয়াছে। মেয়েগুলিও, তোমাকে সহোদরের ন্যায় মনে করে; সুতরাং বাড়ীর সকলেরই তোমার প্রতি স্নেহ-মমতা জন্মিয়াছে। আমি জানি আদুরীকে তুমি খুব ভালবাস, আদুরীও তোমাকে ভালবাসে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আদুরী এখন বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে, নানা স্থানে তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে, অন্যত্র সম্বন্ধ সুস্থির করা, একপ্রকার অসম্ভব। অধিকন্তু তোমার প্রতি আমাদের এবং আদুরীর যেরূপ ভাব, এখন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের ইচ্ছা, তোমার হাতে আদুরীকে সমর্পণ

করি। তোমারও পিতা-মাতা নাই, আমারও পুত্র-সন্তান নাই; অতএব তুমি জাহ্নবীকে গ্রহণ করিয়া আমাদের পুত্রস্থানীয় হইয়া থাক, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িবার ন্যায়, অভয়ের কোমল-হৃদয়টি তখন নিষ্কৃতি লাভ করিল। যে যাহা পাইবার প্রয়াসী, তাহা সহজে পাইবার সুবিধা হইলে লোকের মনে কিরূপ আনন্দ হয়। তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারে না। গিন্নির কথা শুনিয়া অভয়ের মনে কিরূপ ভাব হইয়াছিল, পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে তিনি নিজে বুঝিয়া লইবেন। আমরা তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে অক্ষম। ফলে পাঠক যদি বুঝিতে না পার, তবে আর বুঝিবার দরকার নাই।

গিন্নীর কথা শুনিয়া অভয় কি উত্তর দিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ভাবিল, সম্মতি দিবে; কিন্তু দশজন ইয়ার-দোস্ত আছে, তাহাদের মতামত না লইয়া একটা কথা বলিয়া বসিলে, তাহারা হয় ত মনে করিবে, লোকটা পাগল হইয়াছে। তা ছাড়া, আবার দুইজন মামাও আছেন,' তাহাদের মতামতটা লওয়াও একটু আবশ্যক। অভয়, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, তখন মতামত দিতে চাহিল

না।' আবার ভাবিল, মতামত না দিলে যদি পাছে, হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে এ কষ্ট রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। এরূপ নানাকথা ভাবিয়া, গিন্নীকে বলিল,—আপনার প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত আছে বটে, কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহাদিগের মত লইয়া আপনাকে আমি পাকা জবাব কালই দিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আজ অভয়ের ভারি ফূর্ত্তি। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে, পান চিবাইতে চিবাইতে গরাণহাটর মোড়ে মনীষের বইয়ের দোকানে উপস্থিত; মুখখানি লাল টুকটুকে হয়েছে; তেরিটীর বাহারও মন্দ নয়। কোচান ফিতে পেড়ে কাপড়খানা পরিয়া, কোচা উলটাইয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে; একটী পাঞ্জাবী জামার উপর একখানা কোচান ঢাকাই উরাণী ঝুলছে; তাহাতে একটু একটু আতরের গন্ধও আছে। অভয়ের এই বেজায় ফূর্ত্তি দেখে একজন ইয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে ভায়া! আজ যে বেশ ফূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারখানা কি বল্‌তে পার?"

অভয় একটী সুদীর্ঘ হাসি হাসিয়া বলিল,—"বল্‌ব

বই কি ভাই! তোমাদের না বল্লে আর কাকেই বা বল্‌ব। একটু স্থির হতে দেও, তাহার পর বল্‌ছি। এই কথা বলিয়া, অভয়, চাদর রাখিল, জামা খুলিল; কল্‌কে লইয়া ত মাক সাজিতে বসিল। আর একজন ইয়ার আসিয়া উপস্থিত হইয়া গুণ গুণ স্বরে গাইল,—

"খেলে লো চকোর-চাঁদে,
প্রাণ যারে চায় সে কোথায় ?"

অভয় অম্‌নি বলিয়া বসিল,—"কেনহে ভায়া, আমার মনের কথাটা তুমি জেনে নিয়েছ না কি ?
অভয় অম্‌নি বলিয়া বসিল,—"কেনহে ভায়া, আমার মনের কথাটা তুমি জেনে নিয়েছ নাকি ?"
অভয়ের কথা শুনিয়া, সকলের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একজন অভয়ের হাত থেকে কল্‌কেটি কাড়িয়া লইয়াই বলিল—"বল্‌না মিন্‌সে, ব্যাপারখানা কি ? আজ যে তোর ভারি ফূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি। বলি আদুরীর আদর পাবার যোগাড় হ'লো না কি ?'

অভয়কে, চারিদিক থেকে ইয়ারের দল যেরূপ চেপে ধরিয়াছিল, তাহাতে তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম। অভয়, হাতের কল্‌কেটি ছাড়িয়া, হাতটি ধুইয়া দোকানঘর হইতে বাহির হইয়া প্রাণটি বাঁচাইল। যাহারা চেপে ধরিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সহজে ছাড়িল না। রাধানাথের গিন্নির সহিত অভয়ের যে সকল

কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা ষোল আনা বাহির করিয়া লইল। অভয়, এই বিবাহে মত দিয়া, জিতিবে কি হারিবে, তাহা লইয়া তখন কথাবার্ত্তা, বিচার মীমাংসা চলিতে লাগিল।

বলিতে হইলে, সবকথাই খুলিয়া বলিতে হয়। বিবাহে ঠকা আর জেতা, এই কথা দুটি, আজিকার দিনে, বড়ই ভয়ানক। এতদিন ছিল, ক'নেটি সুন্দরী এবং সুলক্ষণা হইলেই লোকে পরম লাভ মনে করিত; এখন আর সে হিসাব নাই। এখন ছেলের দিকে দেখিতে হয়—পাশ, আর মেয়ের দিকে দেখিতে হয়,—সোণা আর রূপা। এক্ষেত্রে, ছেলের বাপেদের পক্ষেই সুবিধা কিছু বেশী! ছেলে যদি একবার কায়ক্লেশে একটা পাশ ফিরিতে পারে, তবে ছেলের বাপ মনে করেন, তাঁহার হাজার টাকার তোড়া বাঁধা! ছেলে বাবাজী মনে করেন,—ঘড়ী আর ঘড়ীর চেন ত বাবা নিতে পারবেন না, হাজার টাকাই বরং নেবেন।" ছেলের মা মনে করেন,—"এবুড় বয়সে আর আমার গয়না পরবার সাধ হ'লে, লোকে যে মুখে চূণকালি দেবে! এ বুড় বয়সে, ভগবান যখন হাতের নোয়া বজায় রেখেছেন, তখন, একছড়া হার আমার হওয়াই চাই-ই। তা এখন, বউভাতে কিছু ক'ত্তে পার আর নাই পার, আমার এটি হওয়া চাই-ই।

টাকাটা ঘরে আসিবার পূর্ব্বেই. কিন্তু এরূপ ভাবে "কালনেমীর লঙ্কা বণ্টন হইয়া যায়। ছেলের বাপের, যদি, মুদী-পসারী-কাপড়ওয়া পাওনাদার থাকে, তবে ত এই ছেলে দেখাইয়া, ছেলের পাশ দেখাইয়া—আর ছেলের বিয়ের ঘটকীকে দেখাইয়া, দুমাস চারি মাস ধার চালান হয়। এবিষয়ে আমাদের অপেক্ষা নটচূড়ামণি অমৃতলাল বসু, "বিবাহ বিভ্রাটে" এ ছবিটি বেশ আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে, বেপেশো দুই চারিটা মেকীও যে না চলে, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। আদত অপেক্ষা, মেকীর ঝাঁজ বেশী, পাঠকগণের মধ্যে, কেহ যে জানেন না, আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না।

আজি কালিকার হিসাবে, সংসারে যাহারা কিছু পাশ টাশ না দেয়, তাহারাই মেকী! কিন্তু টানের বাজারে, পুরুষ মেকী হইলেও বিকায়; মেয়ে মেকী হইলে আর তাহার দরই উঠে না। আমাদের নায়ক রাধানাথের মত যাহারা দায়গ্রস্ত হন, তাহারাই এই সকল মেকীর কাছে যেসেন। কিন্তু মেকীর তখন বড়ই গুমর বাড়ে। মেকী তখন মনে করে, আমার যদি কেরামত নাই থাকিবে,—আমার যদি মূল্য কিছুই না থাকিবে, তবে এ লোকটা আমার কাছে আসিবে কেন? কিন্তু যিনি এই মেকীর কাছে

যান, তিনি যে, বালির পিণ্ডে পিতৃ শ্রাদ্ধসম্পন্ন করিয়া শুদ্ধ হইতে চান. মেকী কিন্তু ইহা খেয়াল করে না।

এ হিসাবে অভয় একটা মেকী ছিল, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! অভয়ের ইয়ারেরা সকলেই সমগুণসম্পন্ন হইলেও, নিজের চক্ষে কেহ নিজেকে ছোট দেখিতেন না। বিবাহের কথা শুনিয়াই, ইয়ারবন্ধুরা বলিতে লাগিলেন, "নগদ হাজার টাকা. সোণার ঘড়ী সোণার চেন, আর চল্লিশ ভরি সোণা, আর আশি ভরি রূপা না দিলে, তোকে বিয়ে কত্তে দেব না; যদি আমাদের কথা ছেড়ে যাস্, তবে কলকেতা ছাড়া কর্‌ব।" এ ত গেল একজনের কথা; গুড়ুকে দম্ মারিয়া আর একজন বলিল,—কেন হে ভায়া! তুমি জাতকাঠের ছেলে, কুলীন কায়েতের ঘরের খাঁটী ছেলে, তোমার না হয়, বাপ মা কেহ না-ই আছে, তাতে তোমার বংশ-মর্য্যাদা ডুবে যায় নাই ত? পর্য্যায় যখন মিলে গেছে, তখন মিত্রিজাকে একাজ কত্তেই হবে। তাতে আবার ২৬ এর পর্য্যায় ছেলে ঘটা ভারি দায়! কত ঘটকী হয়-রাণ পেরেসান হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছেলে পায়না!"

এ কথা ঢুটী করিয়া ইয়ারদলের সকলেই একটা না একটা মতলব, একটা যুক্তি বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বলিলেন,—না হয় অভয়, মিত্রি-

তার বাড়ীতে বছর খানেক রয়েছেই ; একটা লোকের এক বছরের খোরাকী না হয়, জোর একশত টাকাই হবে। বেশ ত ; একশত টাকার জায়গায়, না হয়, দেড়শত টাকা কেটে নিয়ে, বাকী সাড়ে আটশত টাকা দিক্ না কেন ? এতে ত আর, অধর্ম্ম ক'রেছে বলে, কেহ অভয়কে দূষ্‌তে পার্‌বে না ? তা না হ'লে বাড়ীতে ছিল ব'লে একবারে শুক্‌নো হাতে ত আর কাজ চল্‌তে পারে না। না হয়, অভয় আজ থেকে আর সেখানে নাই থাক্‌বে।"

এক দুই করিয়া ইয়ার দল হইতে ত এরূপ তর্ক মীমাংসা চলিতে লাগিল ; এমন সময় সেই ভুইফোঁড় মামারা আসিয়া উপস্থিত ; সুতরাং সোণায় সোহাগা হইল ! মামাদের কাণে কথাটী পৌঁছা মাত্র এক মামা বলিলেন,—"সে কি কথা ! আজ কায়েতের ঘরের ছেলেটির দাম কত, তা কি কারো জান্‌তে বাকী আছে ? পাশ ফাসের কথা ছেড়ে দেও না কেন ; যদি পর্য্যায় মিলে যায়, তবে পাশে বেপাশে আর কিছু আসে যায় না। আমি বুক্‌ঠুকে বল্‌তে পারি, অভয় বাবাজি যদি, আমার বলেন, তবে আমি নগদ দু হাজার টাকা এবং হাজার টাকার গহনা আদায় ক'রে দশ দিনের ভেতর বিয়ে দিতে পারি। অভয়ের মত ছেলে, আজকাল বাজারে ক'টা মিলে হে বাপু !

এ ত গেল একের নম্বর মামার টিপ্পনী; দুইয়ের নম্বর মামাটি, তখন একটু অগ্রসর হইয়া একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখাইলেন। তিনি বলিলেন,—অভয়ের বাপের যখন বিয়ে হয়, তখনকার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। অভয়ের মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, নেহাৎ তফাৎ নয়। অভয়ের মা, আর আমার বড় মামার শালীর মেয়ে, সাক্ষাৎ মামাত পিসতুতো বোন্! যখন অভয়ের বাপের বিয়ে হয়, তখন নগদ টাকা দিবার আইনটা এতদূর চলে নাই বটে, কিন্তু অভয়ের মাকে, গহনা যথেষ্টই দেওয়া হ'য়েছিল। রূপার পৈঁচে, পায়ে সে কেলে দিব্বি মোটা মোটা ফাঁপা মল; বাহুতে বিশভরি চাঁদির মোটা মোটা তাবিজ; কাণে সোণার ঢেরী, নাকে নথ; আর কত নাম ক'র্ব বল। যেমন তেমন ক'রে তখনকার বাজারের, ৬০।৭০ টাকার গহনা না দিয়ে, অভয়ের ঠাকুরদাদা পার পান নাই। আজ সেই অভয় কি, শুধু হাতে বিয়ে ক'র্ত্তে পারে! যেখানে হাঁসটা, সেখানে ডিম্‌টাও ত হওয়া দরকার!

তিনের নম্বরের মামাটি, এতক্ষণ কোন কথা-বার্ত্তাই বলেন নাই। দুই জনের টিপ্পনী সায় হইলে তিনি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"সে কি কথা। অভয়ের মায়ের বিয়ের কথা আমারও মনে বেশ

জাগ্‌ছে। আমরা জেতে গয়লা হলেও, অভয়ের মাতামহের সঙ্গে আমাদের বেশ দহরম মহরম ছিল; আমার মা, অভয়ের মাকে আতুর ঘরে দুধ যোগাতেন। অভয়ের মা সেয়ানা হয়ে অবধিও আমার মাকে মা বলে ডাক্‌তো, আমরাও তাঁকে আপনার দিদির মত দেখ্‌তুম্; আমার ও মনে পড়ে, যখন অভয়ের মায়ের বিয়ে হয়, তখনশুধু গহনা কেন, সাড়ে আটগণ্ডা টাকা নগদ গুণে দিয়েছিলেন। তা, তখনকার বাজার আর এখনকার বাজারে ঢের তফাৎ। আগে যে, ছাগলটার দর টাকা পাঁচশিকে ছিল, এখন চৌদ্দশিকে চার টাকার কমে তা মিলে না। তখনকার বাজারে যে গরুটা, দুবেলা পাঁচসের দুধ দিত, তার দাম ছিল জোর সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা; এখনকার বাজারে দশগণ্ডা সাড়ে দশ গণ্ডার কম তেমন গরুটা কিন্‌তে পাওা যায় না? যখন গরু ছাগলের দর এতটা তফাৎ হ'য়ে গেছে, তখন মানুষের দর কি আর তফাৎ হয় নাই। তা, এখনকার বাজার মাফিক যা সর রয়, তা ক'রে কাজ করাই ভাল।”

ইয়ারের দল আর মামার দলের যুক্তি তর্কের কথা শুনিয়া অভয়ের আত্মাপুরুষ কাঁপিয়া উঠিল। অভয়, রাধানাথের অবস্থা বেশ জানে; কন্যাদায়ে, রাধানাথ বৃথা আশায় চাকুরীটি ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে বেকার

বসিয়া আছেন, তাহা ও অভয় জানে। এ অবস্থায় ইয়ারদল ও মামার দলের যুক্তিপরামর্শ অনুসারে, রাধানাথকে কোনরূপ চাপদিতে, অভয়ের আদৌ ইচ্ছা নাই। বিশেষ, আতুরীকে সে ভালবাসে; আতুরীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, ইহা তাহার একান্ত ইচ্ছা। যদি ইহাদের পরামর্শমত চলিতে হয়, তাহা হইলে রাধানাথ সামলাইতে পারিবেন না, সুতরাং আতুরীর সহিত তাহার বিবাহ হইবার পক্ষে ঘোরতর বাধা উপস্থিত হইবে। কাজেই অভয় নিতান্ত সমস্যায় পড়িল। একবার ভাবিল, আতুরীর জন্য ইয়ার বন্ধুর কথা অনেকটা উপেক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু মামার দলের প্যাঁচ কাটানো একটু শক্ত।

এরূপ কথাবার্ত্তার পর অভয় বলিল, এখন আর এসব কথা লইয়া বাদানুবাদের দরকার নাই; আমি মিত্রিজা মহাশয়ের নিকট, কৃতজ্ঞতার হিসাবে যথেষ্ট ঋণী আছি। আমি যে সময়ে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনি সে সময় আমাকে আশ্রয় না দিলে, হয়ত, তোমাদের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে লোকের নিকট হইতে এতটা উপকার পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইলে অনেকটা হিসাব করিয়া চলিতে হইবে।

অভয়, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে মনে এ সকল কথা তোলাপাড়া করিয়া ভাবিলেন, যে যাহাই বলুক না কেন, আমাকে একটা জবাব আজই দিতে হইবে। ফলে, আমার ভাবিবার বিষয়ই বা কি আছে? আমি এতদিন যাহাদের স্নেহে রক্ষা পাইয়াছি, তাহাদের মান সম্মান, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ না রাখিয়া কিছুতেই পারিব না। ইহাতে আমার ইয়ারবন্ধুবর্গের সহিত যদি বনিবনাও নাও হয়, তাহাও আমাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। অভয় আপন মনে ইহাই স্থির করিয়া, সম্মতি দিবে বলিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইল; মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া আর কাহাকেও বলিল না।

এ সকল কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতে করিতে দিনটা কাটীয়া গেল, সন্ধ্যা হইল। অভয় দোকানে ধূনা গঙ্গাজল দিয়া, সেদিন একটু শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী যাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

সন্ধ্যার কিছুকাল পরেই, আজ অভয় বাড়ীতে ফিরিল। অভয়ের মন উদ্বিগ্ন, মুখে চাঞ্চল্যের ছায়া দেদীপ্যমান। রাধানাথের গিন্নি, অভয়ের মুখপানে তাকাইয়া একটু চিন্তাকুল হইলেন। ভাবিলেন,—বুঝি ঘটিল না; যাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝি বাধা পড়িল। কিন্তু আর একবার ভাবিলেন,—যখন আদুরীর সহিত বিবাহে অভয়ের নিজেরই ইচ্ছা আছে, তখন তাহার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে, এরূপ লোক কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অভয়ের, এরূপ আপনার লোক কে আছে যে, তাঁহার আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইয়া তাহার মনে কষ্ট দিতে পারে।

গিন্নি আপনার মনে মনে এরূপ তোলা পাড়া করিতেছেন; অভয়, এদিকে নিজের শয়ন কক্ষে, বিছানায় বসিয়া ছাদের কড়িকাষ্ঠ গুণিতেছে; আদুরীর ছোট ভগ্নীরা, আজ অভয়ের নিকট আরও একটু বেশী ঘেসাঘেসী করিতেছে, দেখিয়া, অভয়ের মনে একটু বেশী আনন্দ হইতেছে; গিন্নি কিছুকাল পরেই, তাহা টের পাইলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভয়ের নিজ মুখ হইতে কোন কথা না শুনিতেছেন, ততক্ষণ কোন

কথার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। ভগবানের ইচ্ছায়, তাহা জানিতে আর বেশী বিলম্ব হইল না।

পাঠকের মনে আছে, অভয় গঙ্গাস্নান করিয়া যখন বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন কাগজে মোড়া কি একটী দ্রব্য আনিয়া বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। উহা আর কিছুই নয়, একটী জ্যাকেট। আদুরীর কনিষ্ঠা ভগ্নীর হাতে জ্যাকেটটি দিয়া বলিল, "তোমার দিদিকে চুপি চুপি, এটি এখনি দিয়ে এস।" আদুরীর ভগ্নী আদুরী অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠা হইলেও, দুই বৎসরের তফাৎ মাত্র। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, আদুরীর বয়স তখন চতুর্দ্দশের ঘর ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে ; অতএব এই হিসাবে আদুরীর কনিষ্ঠা বার বছরের বালিকা! আজি কালি, বার বছরের বালিকারা ঘরের গিন্নি হয় ; অদৃষ্ট শুভ হইলে, কোলে একটি ছেলেও থাকে। অতএব অভয়ের নিকট হইতে আদুরীর সওগাদ পাইয়া, অভয়ের মনের ভাব বুঝিতে তাহারও বাকী রহিল না।

আদুরীর ভগ্নী, মুচ্‌কি হাসি হাসিতে হাসিতে, মায়ের হাতে জ্যাকেটটি দিয়া বলিল,—তোমার নূতন জামাইয়েয় সওগাদটী যাকে দিতে হয়, তুমি দেও। গিন্নি একটু চোরা হাসি হাসিলেন। একটু একটু

বুঝিলেন,—ভুক লাগিয়াছে। দ্বিতীয়া কন্যার রহস্যের টিপ্পনী শুনিয়া গিন্নি কহিলেন,—"ও আমার জন্য এনেছে; আমি ঢের দিন থেকে একটা জ্যাকেট্ জ্যাকেট্ ক'রে নাকাল হচ্চি, তাই অভয় সে কথা শুনে আমার জন্যই জ্যাকেট এনেছে।" মেঝ কন্যাও, কাল ধর্ম্মে. নেহাৎ নিরেট ছিলেন না; কন্যাও জননীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তা তোমার যদি এটা হয়, তবে, কোন্ লাজে আর আমাদের জন্য না এনে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌বে।"

অভয়, শোবার ঘর হইতে এ সকল মুন্সীয়ানা কথার লড়াই, বেশ শুনিতেছিল। গতিক দেখিয়া মনে করিল, আরো ক'টা চাই। তখন দ্বাদশীকে কৌশলে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"এটা যার গায়ে লাগে, তাকেই দেও, আর বাকী ক'টা এনে দেওয়া যাবে।" অভয়ের কথা শুনিয়া গিন্নির আর কোন কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন স্পষ্টই বুঝিলেন, অভয় আদুরীর জন্যই জ্যাকেট আনিয়াছে, এবং সকাল বেলা তিনি অভয়ের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে অভয়ের সম্মতি আছে।

যখন এ সকল ঘটনা হইতেছিল, রাধানাথ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। একটু পরেই তিনি আসিয়া

গিন্নির নিকট সমস্ত অবগত হইলেন, এবং অভয় যে ইহা অপেক্ষা বিশেষ খোলসা করিয়া নিজের মনের কথা জানাইতে পারিবে না, তাহাও রাধানাথকে বুঝাইয়া দিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইল; অন্যান্য দিন অভয়, রাধানাথের সঙ্গে একঘরে বসিয়া আহার করে, আজ অভয়ের, তাহাতে একটু লজ্জা বোধ হইল। সুতরাং পাকে প্রকারে, কলে কৌশলে সব কথাই পাকা হইয়া গেল। রাধানাথও গিন্নি, স্থির করিয়া লইলেন,—বিবাহে অভয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা! কর্ত্তাগিন্নি উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন, পুরোহিত ডাকাইয়া কালই বিবাহের দিন স্থির করিবেন। রাধানাথ তখনি পুরোহিত ঠাকুরকে বলিবার জন্য বাহির হইলেন।

আজি কালি, পাশ্চাত্য শিক্ষার তেজে বামুন-পুরোহিতের দরকারটা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে, যাহারা নূতন শিক্ষা পাইয়াও, পূর্ব্বপুরুষের সামাজিক মাকড়সার জালে এখনও আটকা আছেন, তাঁহারাই, সময়ে সময়ে পুরোহিত ঠাকুরের তলব করেন। আধুনিক পুরোহিত মহাশয়েরাও, একবার তলবের গন্ধ পাইলে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জজমানের বাড়ীতে যাইয়া হাজির হন। আদুরীর বিবাহের সংবাদ, পুরোহিত-ঠাকুর, রাত্রিতেই পাইয়াছিলেন। পরদিন তিনি,

এমন সময়ে রাধানাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কড়ানাড়ার ভাব দেখিয়া প্রতিবেশীরা মনে করিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে ঠাকুরের ঘুম হয় নাই। ফলে পুরোহিত ঠাকুর যখন, রাধানাথের বাড়ীর সদরের কড়া নাড়েন, তখন সে বাড়ীর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই!

কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া অভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলিয়া দেখিল, পুরোহিত-ঠাকুর সশরীরে হাজির। তখন বাড়ীর আর কেহ উঠে নাই, কাজেই অভয়ের শয়ন-কক্ষে পুরোহিত ঠাকুরের বসিবার স্থান হইল। বসিবার আসন দিয়া অভয়, পুরোহিত ঠাকুরের জন্য তামাক সাজিতে বসিল। গত রাত্রিতে রাধানাথ যখন পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তখন বিবাহ সম্বন্ধে বেশী কোন কথা-বার্ত্তাই বলেন নাই; তাই তিনি অভয়কে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কোথা সম্বন্ধ হইয়াছে, ছেলেটী কেমন; ছেলেটী কোন পাশ দিয়াছে কি না, কত টাকা, কত গহণা দিতে হইবে, ইত্যাদি সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, অভয় কোন কথাতেই জবাব দিল না; মাথাটা হেট করিয়া আগুণ ফুকতে আরম্ভ করিল! অভয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের মনে, একটু কেমন

কেমন বোধ হইল। কিন্তু সহসা কোন কথা বলিলেন না, রাধানাথের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পুরোহিতের আগমন শুনিয়া রাধানাথ তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং হাতে মুখে একটু জল দিয়াই পুরোহিত ঠাকুরের নিকট হাজির হইলেন। পুরোহিত ঠাকুর দিব্বি একটী থেলো হুকায় শাল-পাতার একটী নল লাগাইয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি মিত্রিজা, আদুরীর সম্বন্ধ কোথা ঠিক কল্লেন? পাত্রটী ভাল ত? কটা পাশ দিয়াছে? টাকা কড়ি বেশী দিতে হবে কি?" ফলে এসকল ব্যাপারে গুরু পুরোহিতেরা যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিলেন। রাধানাথ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত সংক্ষেপে বলিলেন, এবং অভয়ের হস্তে আদুরীকে সমর্পণ করিতে স্থির করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

রাধানাথের কথা শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুর, কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার মাথায় যেন বাজ পড়িল! অন্যূন পনের মিনিট কাল কোন কথাবার্ত্তাই ছিলনা। পুরোহিতের তদবস্থা দেখিয়া রাধানাথেরও বাক্‌রোধ হইল। রাধানাথ, অনেক কষ্টে পুরোহিতকে বলিলেন,—

কেমন মহাশয়, আমার বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কার্য্যটী ভাল হইল না কি? অভয় কোনরূপ পাশ টাশ না দিয়া থাকিলে ও আজি কালি দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। দুই তিন খানা বই ছাপিয়া বটতলায় বিক্রয় করিয়া দুপয়সা সংস্থান করিয়াছে, আরও বই ছাপাইয়া, কাজ বাড়াইতে পারিলে ভবিষ্যতে দুইপয়সা সংস্থান করিতে পারিবে, ইহা আমার বিশ্বাস আছে। আমার ও বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যত্র সম্বন্ধ করিবার সুবিধা পাইলাম না, এজন্য অভয়ের সঙ্গেই থাকিব মনে করিলাম। আপনি এই মাসের মধ্যেই একটী দিন স্থির করিয়া দিন, মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হউক।

পুরোহিত ঠাকুর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, অর্দ্ধ-পক্ককেশগুচ্ছ সমন্বিত টিকীটি আলোড়ন পূর্ব্বক বলিলেন,—তা, তোমার পক্ষে হয়েছে ভাল বই কি? কাজটা ঘরে ঘরেই সেরে গেল, অনেক বাজে খরচের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে; কিন্তু গরীব বামুনের ন্যায্যগণ্ডা প্রাপ্তির পক্ষেই কিছুটা ব্যাঘাত হ'ল? বরপক্ষের কাছ থেকে আর একটী কপর্দ্দক ও পাবার আশাও আমার রইল না। তা তুমি যদি সে সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা কর, তাহা হইলে আর আমার এই গর্ভ-লোকসানটা হয় না। তবে কি জান, আমরা বামুন,

ভিকারীর জাত, দাদা ঠাকুর হইলেও আমরা ভিকারী। আজ কালকার দিনে, আমাদের যা দুর্দ্দশা ঘটেছে জানিত ? এই দেখনা কেন, সেই তোমার বাপের আদ্য শ্রাদ্ধের পর আর বাড়ীতে তুলসী ধরতে এসেছি আমার তেমন মনে পরেনা। সেওত আজ প্রায় ৮।৯ বছরের কথা। অন্য বাড়ীতে বরং বছরের মধ্যে, ব্রত-নিয়ম, শান্তিসস্ত্যয়ন আদি কার্য্যেও দু'একদিন যাতায়াতের সুবিধা হ'য়ে থাকে। মিত্রিজা মশায়, কথা শুনে চটোনা, তোমার সেই পিতৃশ্রাদ্ধের পর আর তোমার বাড়ীর সদর দরজা পার হ'য়েছি ব'লে আমার মনে পড়েনা।

পুরোহিত ঠাকুরের কথা শুনিয়া রাধানাথের হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তিনি নিজেও জানেন, তাঁহার পিতৃ-শ্রাদ্ধের পর আর তাঁহার বাড়ীতে পুরোহিত ঠাকুরের পদধূলি পড়িবার সুবিধা হয় নাই। তাঁহার গিন্নিটী প্রৌঢ়া হইলেও, ব্রত নিয়মাদির প্রতি তাঁহার ভয়ানক বিদ্বেষ। আজি কালিকার চালচলন অনুসারে, জ্যাকেট সেমিজে দেহটি আবৃত করিতে পাইলে, তিনি মনে করেন, ব্রতনিয়ম, যাগযজ্ঞের চরম হইল। এজন্যই রাধানাথের ইচ্ছা থাকিলেও, গিন্নির অনিচ্ছায় সেইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইত না। এজন্যই পুরোহিত

ঠাকুরের কথায়, রাধানাথ নির্ব্বাক রহিলেন। রাধানাথের গিন্নি আসিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর মশায়, অভয়ের সঙ্গে আদুরীর বিয়ে দিবার মনস্থ করিয়াছি; অভয় কিরূপ ছেলে, তাহা বছর খানেক যাবৎ আপনিও দেখিতেছেন। তাহার ব্যবহারে আমরা সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট আছি। আশীর্ব্বাদ করুণ, ইহারা দীর্ঘজীবি হইয়া সুখে কাল কাটায়!

পুরোহিত ঠাকুর, গিন্নির কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তা বটে; তবে কি জান, আমরা গুরুপুরোহিত, প্রণামাটার উপরেই আমাদের জীবিকা; অভয়ের সঙ্গে আদুরীর বিয়ের প্রস্তাব হওয়ায়; আমার পক্ষে একটু লোকসান দেখ্‌তে পাচ্ছি। যখন বরযাত্রা কন্যাযাত্রা এক, তখন আমার পক্ষে, দেনা পাওনাটা আধাআধি হ'য়েই গেল। যা হোক্ নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করুণ; আমার সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা, একটুকু বিবেচনা ক'রে ক'রো, এই আমার একমাত্র অনুরোধ।"—

গিন্নি ঠাকরুণটী, নেহাৎ খেলো লোক ছিলেন না। তিনি সাত কথা পাঁচ কথা দিয়া, পুরোহিত ঠাকুরকে ঠাণ্ডা করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, পাঁচ দিন পরে বিবাহ। পরদিন গা'য় হলুদ হইয়া গেল; তত্ত্ব-বার্ত্তা পাঠাইবার দরকার হইল না। রাধানাথ, মনে মনে,

ভাবিলেন, এযাত্রা ভালয় ভালয় কেটে গেল। কিন্তু যাহার অদৃষ্ট খারাপ থাকে, তাহার তৈয়েরী অন্নেও ছানা পড়ে। রাধানাথের পক্ষে ঠিক ততটা না হউক, বিবাহের দিন অভয়ের ইয়ারবন্ধু এবং ভুইফোঁর্ মামারা একটু গোলমাল বাধাইলেন। বলাবাহুল্য, বিবাহের দিন, অভয় তাহার ইয়ারবন্ধু এবং মামা তিনটীকে আহ্বান না করিয়া পারেন নাই। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, তাঁহারা, গ্রামভাটি বারোয়ারী, বরের ঘড়ী ও ঘড়ীর চেন এবং বরদাক্ষিণা স্বরূপ একশত টাকা নগদ না পাইলে বর ছাড়িবেন না বলিয়া, জোট করিয়া বসিলেন। রাধানাথের মাথায় বাজ পড়িল, তিনি অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিলেন; ইয়ার বন্ধু এবং মামাত্রয়ের পায় ধরিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। এদিকে লগ্ন উপস্থিত! রাধানাথ অগত্যা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন; আদুরীর বিবাহ হইয়া গেল, অভয় ও আদুরী বাসর ঘরে গেলেন।

সম্পূর্ণ।